সে আমাকে কয়েকটি রাত উপহার দিয়েছিল

মাতিউর রাহমান

জন্ম	:	১ জানুয়ারী ১৯৭১
জন্মস্থান	:	চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বাংলাদেশ
পিতা	:	মাহাবুবুল হক
মাতা	:	সহর বানু
শিক্ষাজীবন ও পেশা	:	চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, ঢাকা ও রাজশাহী মানবিক শাখা স্নাতক ডিগ্রী অর্জনের পর ল'কলেজে ভর্তি হন। অত:পর সরাকারী চাকুরীতে যোগদান।
সম্পদনা	:	গল্পের পত্রিকা গল্পকল্পের সম্পাদক ও ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা পরিলেখ-এর সহকারী সম্পাদক এছাড়াও বিভিন্ন সম্পাদনা কাজের সঙ্গে জড়িত
প্রিয় কাজ	:	বইপড়া ও দেশ ভ্রমণ
প্রকাশিত গ্রন্থ	:	গল্প: পদ্মাপাড়ের গল্প (যৌথ: ২০০৭) ও মায়াবী জোঁক (২০০৭) উপন্যাস: আকাশের অনেক রঙ (২০০৮) ও অন্তরযাত্রা (২০০৯)।
পুরস্কার	:	প্রথম বই 'মায়াবী জোঁক' (২০০৭)-এর জন্য শব্দশীলন একাডেমী, ঢাকা কর্তৃক প্রদত্ত 'শব্দশীলন সাহিত্য পুরস্কার-২০১০' অর্জন।
বসবাস	:	রাজশাহী ও গোদাগাড়ী।
মুঠোফোন	:	০১৭১২-৮৭০১১০।

মাতিউর রাহমানের শিল্পকৌশল তার অভিজ্ঞতার নির্যাস, জানার বাইরে গিয়ে অন্ধের মতো যষ্টি হাতড়াতে রাজী নন তিনি। তাই তার প্রতিটি গল্প হয়ে ওঠে আমাদের অন্দর ও বাইরে প্রতিন্যাস। মানবসত্তার অনুসন্ধান ও ব্যাখ্যায় এবং জীবনবীক্ষার বিবিধ রূপায়নে তিনি কুশীলবদের অভ্যন্তরীণ ভাংচুর ও বাহ্যিক প্রতিতুলনার মাধ্যমে পরিবর্তমান জীবনের রূপকল্প নির্মাণ করেন।

জীবন বাস্তবতার নিপুণ অনুপুঙ্খ সৃষ্টিতে গল্পকার পারদর্শিতার পরিচয় দেন, কখনো কখনো তা উপমা ও প্রতীকের কাব্যময়তায় ভাবালু, আবার কখনো নিয়ম কঠোর অভিঘাতময় বর্ণনায় ভণ্ডামির মখোশ উন্মোচনে সক্রিয়।

তার গল্পে আখ্যান আছে, বিন্যাস আছে, ভাষার কারুকৃতিও প্রশংসনীয়। সর্বোপরি মানবসত্তার অবয়বকে চিহ্নিত করার প্রয়াসে তার গল্প মানবিক অভীপ্সায় প্রাণময়। এই জীবনকে অতিক্রম করে নতুনতর জীবনে উৎক্রমণ তার লক্ষ্য।

সে আমাকে কয়েকটি রাত উপহার দিয়েছিল-এর গল্পগুলো মাতিউর রাহমান সম্পর্কে আমাদের মাঝে প্রত্যাশা জাগিয়ে তোলে জীবন সম্পর্কে এবং তার সম্পর্কেও।

নাজিব ওয়াদুদ
কথাশিল্পী

সে আমাকে কয়েকটি রাত উপহার দিয়েছিলো

মাতিউর রাহমান

www.pathagar.com

সে আমাকে কয়েকটি রাত উপহার দিয়েছিলো

মাতিউর রাহমান

প্রকাশক ☐ পরিলেখ
ঐশিক, আব্দুল হক সড়ক, রাণীনগর
ঘোড়ামারা, রাজশাহী।

প্রথম প্রকাশ ☐ একুশে বইমেলা ২০১১

গ্রন্থ স্বত্ব ☐ মমতাজ পারভীন

প্রচ্ছদ ☐ কামরুল হাসান মিলন

অক্ষরসজ্জা ☐ মখলেছুর রহমান,
একটিভ কম্পিউটার, বিনোদপুর,
মতিহার, রাজশাহী

মুদ্রণ ☐ পদ্মা অফসেট প্রিন্টার্স, মালোপাড়া
(মহিলা কলেজ রোড), রাজশাহী।
০১৭৪০৯৪৬৮৪০।

দাম ☐ একশত পঁচিশ টাকা

SA AMAKA KOEKTI RAT UPOHAR DIACHHILO Written By Matiur Rahman, Published by Porilekh, Oisik, Abdul Huq Road, Raninagar, Ghoramara, Rajshahi, Bangladesh. Cover: Kamrul Hasan Milon. Date of Publication: December 2010, Price: Tk. 125.00 only.

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আব্বা-আম্মা
মাহাবুবুল হক
ও
সহর বানু

যাঁদের কারণে আমার
এই পৃথিবীতে আসা
তাঁদের জন্যে আমার
অনন্ত ভালোবাসা।

www.pathagar.com

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

ছোটগল্প পদ্মাপাড়ের গল্প (যৌথঃ ২০০৭)
মায়াবী জোঁক (২০০৭)

উপন্যাস আকাশের অনেক রঙ (২০০৮)
অন্তরযাত্রা (২০০৯)

www.pathagar.com

গ|ল্প|সূ|চি

দাঁড়াশ	৭
রঙিন কাচের আয়না	১৫
অদৃশ্য নিয়তি ও শিমুল গাছ	২৩
জাহাজঘাটের দিলরুবা	২৯
অস্তায়মান দু'টো হাত	৪৫
দোল নেই দোলনার	৫০
কৃষ্ণপুরের রাধিকা	৫৫
ন্যাপথলিনের বল	৬১
মন ও মুখোশ	৬৬
ভিমরুল	৮০
সে আমাকে কয়েকটি রাত উপহার দিয়েছিলো	৯০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দাঁড়াশ

ভেতর দরজার ওপাশে চারটে পুরোনো আমলের ঘরের বিশাল বারান্দা পেরিয়ে কালোনের কথাগুলো বাতাসে ভেসে এলো ব্যামাতীর কানে। অনুযোগ কিংবা অভিযোগতো বটেই—তবে আর পাঁচ দিনের চেয়ে বেশ ঝাঁঝালো ও তীব্র। শ্যালিকা কালোনের কথার ঝাঁঝে বুকের ক্ষুদ্র অস্থিরতা অস্বাভাবিক রকম বেড়ে যায় ব্যামাতীর। তবে ব্যামাতী যে ওর আসল নাম তাও কিন্তু নয়। বংশের নাম রইস। সম্মানি বংশ। বাপ ছিলো পাঁচ গ্রামের বিচার করা মোড়ল। ভেবে-চিন্তেই নাম রেখেছিলো সোহরাব হোসেন রইস। জমি-জিরেত, বিষয়-সম্পত্তি সব কিছু বৃদ্ধি পেলেও শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারেনি নিজের নামটা। বিচার-শালিস-আলোচনা সবকিছুতেই নিজের মতের সঙ্গে না মিললেই বে-মত করে বসে। মতের কোনো ঠিক থাকে না। সামাজিক কল্যাণমূলক কাজে গ্রামের সমস্ত লোক সম্মতি জানালেও সোহরাব বে-মত করে বসে। সকালে দেয়া সম্মতি বিকেলে পাল্টে ফেলে, এমন মানুষ কী সমাজে খেতাব ছাড়া হয়?

মুখে মুখে—রটে যায় ব্যামাতী।

শুধু কি তাই? বাবার রাখা নামটাও ছেলে-ছোকরার দল এক রকম জোর করেই মুছে ফেলে। সোহরাব নামের উর্বর জমি কত কাল আগেই চাপা পড়ে গেছে ব্যামাতী নামের বালুকা বেলায়। তবু ওর আফসোস ছিল না, যদি সম্মানি বংশের তিনক্ষরের 'রইস' নামটা অবশিষ্ট থাকতো। ওর বাবাকে যখন সবাই 'রইস' বলে ডাকে, মর্যাদায় ওর বুকটা অনেকাংশে ভরে উঠে। কিন্তু কুট সমাজের একটা লোকও তাকে সে নামে ডাকে না। ডাকে—ব্যামাতী, মানে খারাপ মতি বা মন।

সত্যিই কী সে খারাপ মনের মানুষ?

www.pathagar.com

নিজের কাছে ওর নিজেকে মনে হয় চালাক-চতুর-বুদ্ধিমান-সাহসী মানুষ। চালাক হওয়া কী দোষের? এলাকার মানুষগুলো ওর সম্পদ, বুদ্ধিমত্তা দেখে হিংসে করে। এছাড়া আর যায় হোক, বাড়ির ভেতরের সম্মানটুকু তার এখনও অটুট রয়েছে। নিজে উচ্চ-বাচ্য করলেও ওর সামনে কেউ দাঁড়াতে পারে না চোখ তুলে।

তবে ওর-ই আশ্রীতা শ্যালিকা কালোন কেনো আজ চিৎকার করে ডাকছে?

মেয়েটি দেখতে সু-শ্রী। ছিমছাম দীর্ঘাঙ্গী চেহারা। ওর বাবা-মা নিশ্চয় বে-রসিক ছিলো। নইলে এমন সুন্দর মেয়ের নাম কেউ কালোন রাখে? অবশ্য ব্যামাতী তা বলে না। ডাকে কালোনী বলে। সেই কালোনীর গলায় আজ বাড়ির গিন্নীর মতো জোরালো ঝাঁঝ! যেন—চিৎকার নয়, ওর কানকে ছিদ্র করে সুঁচ ফুঁড়ে দিচ্ছে।

দুলাভাই ও দুলাভাই, শুনতে কী পাওনা?

দ্রুত আসতে গিয়ে দরজার কবাটে বাড়ি খায়। দু-পাশে হাড়াস করে খুলে যায় দরজা। চমকে ওঠে ব্যামাতী। টেবিল থেকে ঘাড় ঘুরায় বাম পাশে। চওড়া কপালে অসংখ্য হিজিবিজি ভাঁজ। কি হয়েছে। এতো অস্থিরতার মানে কী?

দুলাভাই তুমি এখানে!
দেখতিতো পাচ্ছো আমি এখানে এবং তোমার সামনেই।
দুলাভাই, মানে মানে ...
তোমার কী মানে ছাড়া মুখে কথা আসে না। কী হয়েছে?
দুলাভাই-এর কাছে কালোন একটু ঘন হয়ে বসে। বলে, তোমার ছেলে রানা!
ওই হারামজাদা আবার কী ঘটালো?
নজরুল ঠিকাদারের গ্রীল ভেঙে...
গ্রীল ভেঙে কী তোমার মুখে পড়লো যে বলতে পারছো না।
ঠিকাদার নজরুলের মটর সাইকেল নাকি ও চুরি করেছে।

হঠাৎ ব্যামাতীর ঝাঁঝালো গলাটা যেন খাদে নেমে যায়। বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকে ঝিমধরা মোরগের মতো। সহসা বলে ওঠে, হ্যাঁরে কালোনী, ও নাকি সিনেমা হলে কাজ পেয়েছিল?

তোমাকে তো অনেক কথায় বলতে পারিনা। ওর গলা ভালো, তাই সোলেমান চাচা মাইকিং-এর কাজটা ওকে দিয়ে ছিল। কিন্তু সেখানেও ঘাপলা মারে। কি সব ছাই-পাস খায়। টাকা ফুরোলে গতকাল সে এ ঘটনাটা ঘটিয়ে বসে। পাড়াতে এনিয়ে নানান গুঞ্জন। ঠিকাদার বাড়ি এলেই হয়তো লঙ্কাকান্ড বাধিয়ে বসবে।

সিগারেট ধোঁয়ার মতো দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ব্যামাতী বলে, হারামজাদাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলাম, তবু একটুও বদলালো না। আর ওর জন্যে ষাট বছর বয়সে মাথা নিচু করে মজলিসে দাঁড়াতে হবে?

www.pathagar.com

ব্যামাতী হিসেবী মানুষ। সারা জীবন হিসেব করে তিলে তিলে জমিয়েছে বিশাল সম্পত্তি। কিন্তু মানুষ হলো না ছেলে দুটো। অনেক টাকাকড়ি খরচ করে গেলবার হজ্ব করে এলো। তবু কেউ তাকে 'হাজীসাহেব' বলে ডাকে না। নিজের সংসার-সন্তান-সমাজের মানুষগুলোর প্রতি কেমন একটা বিতৃষ্ণা ছড়িয়ে পড়ে মনের ভেতর। ক'দিন ধরে দেখা দিয়েছে নতুন করে আরেক সমস্যা। রাত হলেই একটা দাঁড়াশ সাপ পিলপিল করে বাড়িতে ঢোকে। গোয়াল ঘরের দরজার ফাঁক গলে ভেতরে সেঁধোয়। ধীর গতির সু-তীক্ষ্ণ উপস্থিতি। ভারী মোটা শরীর নিয়ে কোনো মতে ঘুরে দাঁড়ায় ব্যামাতী। টানা বারান্দা পেরিয়ে ঘর থেকে আসতে যা দেরী। হাতে তিন ব্যাটারীর টর্চ। ঢুকবার সাহস পায়না গোয়াল ঘরে। খুপরী জানলা দিয়ে মেলে ধরে টর্চের আলো। চোখে পাওয়ারঅলা চশমার ফাঁক গলে গভীর অভিব্যক্তির ছটা। ব্যামাতী হঠাৎ গলা চড়িয়ে বলে, কালোনীরে, কালোনী। এদিকে আয়তো একবার।

তল্লা বাঁশের ছ্যাউকাটা লাঠি চিলেকোঠার ঘর থেকে নিয়ে আসে। ততক্ষণে ঘুম কাতুরে ঢুলুঢুলু চোখে উঠে আসে কালোনী। এবার আর জানলা নয়। সরাসরি দরজা খুলে। কিন্তু একি! অতবড় সাপটা মুহূর্তে যেন মিলিয়ে গেল। ছায়াটি পর্যন্ত নেই। খুটাতে বাঁধা বড় দুধেল গাভীটা কেমন আটিং পিটিং-করছে। মশা তাড়াবার ভঙ্গিতে দুপাশে দোল খাচ্ছে লেজের গোছা। শরীর আবৃত রোম খাড়াখাড়া হয়ে তাকিয়ে আছে কাঁটার মতো। ছোট বাছুর গরুটা অদূরে বাঁধা। ব্যামাতী এবার টর্চ মারে দুধেল সামাড়ে। মৌচাকের মতো থলথলে সামাড়। টসটস করে তখনও দুধ পড়ছে বৌটার আগা দিয়ে।

রাতের বাকি অংশ আর ঘুম এলো না ব্যামাতীর। ফৌটাফৌটা দুধ পড়ার দৃশ্য বার বার ঘুরে ফিরে আসে চোখের সামনে। ভেতরের অস্থিরতার পুঞ্জপুঞ্জ মেঘ ভাবনার ডানায় ভর করে মস্তিষ্কের নার্ভগুলোয় মোচড় দিয়ে ওঠে। বারো বছর আগের স্ত্রী মানিকজানের ফাঁস ঝুলানো চেহারাটা ভেতরের অস্থিরতাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। মানিকজান শুধু নারী হিসেবেই নয়। মানুষ হিসেবেও ছিল দারুন সদালাপী। শান্ত-ধীমান ব্যক্তিত্ববান চেহারার ভেতর সব সময় নড়ে উঠতো পাতলা গোলাপ গোলাপ ঠোঁট। মুখময় ছড়িয়ে থাকতো কচি আমপাতার ঠিকরে পড়া লাবন্য। তখন শরীরে ওর ছলকে ওঠা আগুন দাপানো যৌবন! চওড়া উদ্ভাসিত পিঠে ধানশীষের মতো পাকানো বিনুনি। নাকে নীল নাকফুল। বড়সড় গতরের চঞ্চল অথচ গভীর নক্ষত্রের মতো চোখ।

সেই চোখ একদিন অস্বাভাবিক রকম বার করে। মাড়ির ফাঁক গলে অর্ধেক জিব্বা মেলে ধরে, বাড়ির পেছনের আমগাছের ডালে ঝুলে থাকে। ফাঁসের দাগ বসে ঘী-য়ের মতো মসৃণ গলায় ফুটে বেরোয় নীল দগড়া দগড়া রগ। মানিকজান শুধু খালি খালি যায়নি। ব্যামাতীর ওপর অভিমান করেই চলে গেছে। যেখান থেকে কেউ আর ফিরে আসতে পারে না।

www.pathagar.com

বাড়ির পেছনে বিস্তৃত চৈতালী মাঠ। অধিকাংশ জমি-ই ব্যামাতী আর মাতবরের। রকমারী ফসলের আবাদ। সরিষা-তিসি-মশুর-ছোলা-গম ইত্যাদি পেকে সোনালি রঙ বর্ণ ধরে। যে দেশে যে চাল (নিয়ম)। মশুর-ছোলা-সরিষা এগুলো ভাগের হিসেবে গরীব কিষাণের ছেলে-মেয়েরায় তুলে থাকে। বিশেষ করে কিশোর-কিশোরী, উঠতি যুবতীরাই একাজ করে থাকে। বরাবর ব্যামাতী হাসিমুখের মশুর তুলতে আসা ছুঁড়িগুলোকে 'লাতিন' বলে ডাকে। একদিন রুমালিকে মশুর তোলার পাওনা ভাগ দ্বিগুণ দিলে কিশোরী ফুলন বলে,—নানা, তোমার স্বভাব তো খুব খারাপ। এক সমান মশ্‌রী তুল্যা তুমি অকে বেশী দিল্যা কেনে?

ব্যামাতী কাছে আসে। সবার সামনেই ফুলনের কচি গালটা জোরে কচলে দেয়। মুখ বেঁকিয়ে ঠোঁট উল্টে বলে, তুইও বড় হ তোকেও দেব।

একদিন রুমালীকে নিয়ে ব্যামাতী কাজ করছে মশুরের খৈলানে। সহসা আমতলায় দুজনকে বিশেষ একটা ভঙ্গিতে দেখে ফেলে স্বয়ং মানিকজান। এ দৃশ্য অনুমান তো দূরে থাক, কল্পনাও করেনি সে। ক'দিন আগেই আইনাল কিষাণের বাড়িতে অপমান হয়ে ফিরে এসেছে। সাতদিন না যেতেই তার চোখের সামনে একি! সেই দিন-ই গলায় ফাঁস দিয়ে বিদায় নেয় মানিকজান।

বাড়ির পেছনে খামার বাড়ি। দক্ষিণে সহস্র আমেরগুটি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ল্যাংড়া আমের গাছ। গাছের নিচে কোমর অব্দি বাঁশের মাচা। মাচায় মৃদু হেলান দিয়ে শুয়ে আছে ব্যামাতী। পাশে বর্ণময় কাঁসার থালা। থালায় সাজানো মাস-কলায় আর চালের রুটি। ব্যামাতী হাত দিয়ে অনুভব করে কালোনীর বানানো রুটির উষ্ণতা। পেঁয়াজ-মরিচ-লবনের মিশ্রণে চুবিয়ে চুবিয়ে খায়। সহসা ওর মাড়ির দাঁতগুলো আপনা মনে থেমে যায়। মনে পড়ে মা-মরা ছেলে দু'টোর কথা। হয়তো নেশা করে না খেয়ে পড়ে আছে কোথাও। কিংবা ক্ষিদের জ্বালায় এমন কাজ করছে, যা সোহরাব ব্যামাতী নিজেও ভাবতে পারে না। এছাড়া ওর কি-ই বা করার আছে। সে তো আর ইচ্ছে করে তাড়িয়ে দেয় নি। প্রতিদিন দুটো ছেলের নামে কম করে দশটি নালিশ ওর কানে আসে। আর জরিমানা? তার তো হিসেব-ই নেই। পাঁচ হাজার, সাদ হাজার হর-হামেশা। এভাবে চলতে থাকলে ওকে আজ পথে বসতে হতো। শেষাবধি বাধ্য হয় কুলাঙ্গার দুটোকে একরকম ত্যাজ্য করতে।

ভাবনার ফেনীল তরঙ্গ থেকে থেকেই ব্যামাতীর মনে দুলে উঠে। হয়তো ওর কারণেই ছেলে দুটোর আজ অমন দসা। দেরিতে হলেও নিজের ভুল নিজে বুঝতে পারে। ওর কারণেই মারা গেছে রানার মা। মা মারা গেলে কিছুটা হলেও দ্বায়ীত্ব পালন করে বাবা। সে কি তা পেরেছে? সারাক্ষণ ব্যস্ত শুধু, জমি-ফসল-আবাদ আর খামার বৃদ্ধির নেশায়। সমস্ত জমি, জমি হয়েই পড়ে থাকে। মাঠে অগাধ ফসল। বারো ভূতে লুটে খায়। ছেলে দুটো এখন মরে গেছে না বেঁচে আছে তাও জানে না।

www.pathagar.com

ক'দিন আগে ভদ্র গোছের ক'জন লোক এসেছিলো। ব্যামাতী তখন খামার ঘরে। ওদের প্রস্তাব শুনে সোহরাব ব্যামাতী, কিছুটা হলেও মুচকী হেসে ছিল। আলোচনার এক ফাঁকে নশিপুর কলেজের সভাপতি চৌধুরী নজর আলী বলে বসে, দুটো ছেলে দুটোয় ভিটে ছাড়া। ওপরওয়ালা আপনাকে অঢেল সম্পদ দান করলেও, আপনার অবর্তমানে দ্বিতীয় পুরুষটি নেই সংসারে। এ পর্যন্ত এসে মুদ্রা দোষে প্রবিষ্ট সভাপতি ঢোক গিলে। পুনরায় বলে, তাই বলছিলাম কী। মানে...।

ব্যামাতী মনে মনে বলে, বলছিলাম কী আমিও জানি, কিন্তু বলবো না। তুমিই বলো।

নজর আলী গলা খাকারী দিয়ে পুণরায় বলে, বেঁচে থাকতেই যদি বিশাল সম্পদের একটা ট্রাস্ট গঠন করে যান, তবে আপনার সম্পদের যেমন মূল্যায়ন হবে—তেমনি দারিদ্র-নীগ্রহ জনগণও উপকৃত হবে। সেই সাথে আপনার নামটাও স্মরণীয় হয়ে থাকবে সেবা-মূলক কাজে।

নজর আলী থামলে পাশে বসা সেক্রেটারী বলে, কিছু সাদা স্ট্যাম্পও আমরা নিয়ে এসেছি কলেজের পক্ষ... আর একটি কথাও বলতে পারলো না কলেজ সেক্রেটারী। কথা কেড়ে নিয়ে সোহরাব ব্যামাতী দুম করে বলে বসে, অনেক হয়েছে—এবার শান্ত হোন। শিক্ষকদের ঐ এক-ই দোষ। বলার সুযোগ পেলে সবাইকে ছাত্র জ্ঞান মনে করে। দয়া করে আজকের চা-টা অন্য কোথাও গিয়ে খান গে। আপনার কথায় শরীলের রক্ত ছলকে ওঠে। আর মুহূর্ত যদি আমার ঘরে দাঁড়ান, মাথার চাঁদিতে গিয়ে ঠেকবে ঐ ছলকে ওঠা রক্ত। কত কষ্টে গড়া এ সম্পদ। আর বেঁচে থাকতেই এর মালিক হবে অন্য কেউ? প্রয়োজনে জমি আমার ভূতে খাবে, তুব এসব টাস্ট-ফাস্টের ভেলকিবাজিতে আমি নেই।

খাবারের থালা সামনে। মাঁচায় কাত হয়ে শুয়ে আছে ব্যামাতী। চোখ দুটো তার গোয়াল ঘরের জানলায়। কখন থেকে যে আমতলায় ঠাই দাঁড়িয়ে আছে কালোনী, পলক ফেরাতেই চোখে পড়ে ব্যামাতীর।

কি রে কালোনী। কিছু বলবি?

তোমার গায়ের জামাটা দরকার। কাপড় খাঁচতে বোস্যাছি। ব্যামাতীর মাংশ থপথপে মোটা শরীর। আড়মোড়ার ভঙ্গিতে খুলে দেয় জামার সাথে গেঞ্জীটাও। পরনের ট্রেট্রন পাঞ্জাবীটা দুলাভাই-এর চিনতে হলে চোখ লাগাতে হবে দীর্ঘক্ষণ। আসল রঙ জ্বলে গিয়ে ধারণ করেছে কেমন খসখসে চিটে রঙ। দীর্ঘক্ষণ জামার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে, দুলাভাই একটু আদর করে দেয়—কালোনীকে। হাসি বেরোলো কালোনীর ঝকঝকে দাঁতের পাটি সাজিয়ে। ওর চটপটে নরম শরীরটা আহলাদে কেমন মোচড় দিয়ে ওঠে। ব্যামাতী কালোনীর পিঠে হাত ও কণ্ঠ ছুঁইয়ে বলে, শুধু শুধু আমার জন্যে

www.pathagar.com

জীবনটা অমন নষ্ট করে দিলি। একজন তো অভিমান করেই চলে গেল। ছেলে দুটারও কোনো খবর নেই। কেবল বকের চক্ষু নিয়ে তুই-ই আগলে রাখলি এই মন্দ মানুষটাকে।

কালোনী হুমড়ে পড়া কান্নাকে বুকে চেপে ছুটে যায় অন্য ঘরে। রাজ্যের ভাবনাকে চেতনার নেপথ্যে বিলীন করে—ফ্যাকাশে দৃষ্টিতে আকাশমুখি চেয়ে থাকে ব্যামাতী। চৈত্রের খরদৃষ্টিতে ভেসে ওঠে, একপাশে লম্বা জিহবহা বার করা বড় বড় চোখের সেই ভয়াবহ মুখ!

দু পহর রাত। পুরোনো আমলের নকশা করা পালঙ্কে শুয়ে আছে সোহরাব ব্যামাতী। গভীর ঘুমে মগ্ন দুটি চোখ। রাজ্যের বিক্ষিপ্ত চিন্তাগুলো বুঝি, ক্ষণিকের জন্যে সরে দাঁড়িয়েছে ওর ঘুমায়ীত শরীর থেকে। উত্তরের জানলা গলে ঠিকরে পড়ছে ভরা পূর্ণিমার রূপোলী আলো। জানলা ধারের পালঙ্কের গা চক্‌চক্ করছে ঝক্‌ঝকে আলোর ছটায়। নারকেল পাতার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ে ফালি ফালি চাঁদ। তামাম পৃথিবী জুড়ে স্বর্গীয় আলোর মোহণীয় বিকিরণ। অহরহ কুরে খাওয়া ভাবনাগুলো জ্যোৎস্নার আলোয় মিশে, স্বপ্নের মাঝে ধরা দেয় ব্যামাতীর মস্তিষ্কে।

জীবনের সবগুলো কর্ম-অপকর্ম মিলে হয়ে উঠেছে খোয়াবের একেকটি প্রাণ। চেনা-জানা অসংখ্য মুখ কিলবিল করছে চোখের সামনে। খামার-বাড়ি থেকে চুপ করে বেচে দেয়া বাবার এক পাল গরু। নিজের নামে জাল করে নেয়া বড় ভাই-এর জমির দলিল। ছোট ভাই-এর সঙ্গে বাড়ি কিনে, দলিল হয় স্ত্রীর নামে। খাসজমি বন্দবস্ত করে গড়ে তুলে বিশাল আম বাগান। আরও অসংখ্য নাম না জানা মানুষের জমি, বে-নামিতে চলে আসে নিজের নামে। প্রতিটি জমি-জমির ফসল, আম বাগান-বাগানের ফল, গাভীর পাল-পালের প্রতিটি গরু লকলকে জিব্বার একেকটি সাপ হয়ে ক্রমশ ছুটে আসছে। সেদিনের গোয়াল ঘরে ঢুকে পড়া দাঁড়াশটি সবগুলো সাপের সর্দার হয়ে দ্রুত সামনের দিকে এগুচ্ছে। ছুটতে ছুটতে ব্যামাতী বাড়ির মুখে দাঁড়ানো আমগোছের তলায় এসে থামে। চেষ্টা করে ওপরে ওঠার। কিন্তু একি! যে ডাল ধরে সেটিই ভেঙে পড়ে।

দীর্ঘ চেষ্টায় কোনো এক অদৃশ্য হাতের ছোঁয়ায় উঠে পড়ে গাছের মগ ডালে। সাপগুলোও ছুটে আসে গাছ বেয়ে। কেঁচোর মতো কিল্‌বিল্ করে উঠে আসে একজন আরেক জনের গা বেয়ে। মূহূর্তে গর্জে ওঠে সর্দার হয়ে ছুটে আসা বড় আকৃতির দাঁড়াশ। ছোবল মারে ব্যামাতীর ঠিক মুখ বরাবর। সঙ্গে সঙ্গে বিকট চিৎকারে ছিটকে পড়ে মগডাল থেকে নিচের মৃত্তিকায়।

ঠিক এ মুহূর্তে ঘুম ভেঙে যায় ব্যামাতীর। খাটের ওপর গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে। অস্বস্তি আর অস্থিরতায় বুকের ভেতর কেমন মোচড় দিয়ে ওঠে! পাশের টেবিলে ছিল কালোনীর সন্ধ্যেরাতে রেখে যাওয়া পানি। এক নিঃশ্বাসে খেয়ে ফেলে পুরো এক জগ।

www.pathagar.com

বুকের ভেতর এখনও গম পিষানো কলের মতো বাড়ি খায়। ঘরের ঝুপসি কোনে হ্যারিকেনের আলো খানিকটা উস্কে দেয়।

হঠাৎ গো-সালার পাশে ঠেস দেয়া লাঠি গড়িয়ে পড়ার মতো ঠট্‌ঠর শব্দ হয়। আতঙ্কে টর্চ লাইট তুলে ধরে ব্যামাতী। শব্দটা যেন তাকে এক দূরভীসন্ধির পথে নিয়ে যায়। ঘর থেকে বার হয় বল্লম হাতে। টানা বারান্দা পেরিয়ে নেমে আসে উঠোনে। ক'দিন ধরে সদ্য বিয়ানো গাভীটাকে যে দাঁড়াশটি জ্বালাতন করে মারছে—চোখের সামনে সেই জানোয়ারটি গোয়াল ঘরে। সমুখে তাকাতেই কেমন ঝিম্‌ঝিম্ ঘনিয়ে আসে মাথার ভেতর। ব্যামাতী খানিক থতমত, খানিক অস্থির। কী করবে কাকে ডাকবে বুঝতে পারে না। হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে স্বপ্নে দেখা ভেতরের জমাট বরফ ও পুঞ্জপুঞ্জ মেঘ। মুখের ভাঁজে ভাঁজে গজিয়ে উঠে আরও কিছু অতর্কিত ভাঁজ। ভারী-মোটা শরীর মুচড়ে কোনো মতে ঘুরে দাঁড়ায় পেছন দিকে। ভরাট অথচ ঝুলে থাকা গাল দুখানি ধরথর কাঁপে। ধরা গলায় আওয়াজ আসে, কালোনী, কালোনীরে। এদিকে আয়তো। ঐ জানোয়ারাটা আবার আইস্যাছে।

গোয়াল ঘরের ঝাঁপ সরিয়ে টর্চ মারে। টর্চের আলো ঠিকরে পড়ে মৌচাকের মতো গাভীর ঝুলন্ত ওলানে। ওপাশে বাঁধা অবস্থায় ছটফট করছে ধেনু-বাছুর। সারা রাতের জমে থাকা দুধের ভারে থলথলে ওলান কেমন চকচক করছে। কিন্তু একি! সেদিনের ওকে দেখে পালিয়ে যাওয়া জানোয়ারাটা আজ আর কেন যেন একটুও নড়ছে না। দাঁড়াশের সুঁচালো দু-ঠোঁটের ফাঁকে ওলানের বোঁটা। চপচপ শব্দের সাথে জানোয়ারটার চিবুক গড়িয়ে নামছে দুধের ধারা। গাভীর পেছনের পা দুটো দড়ির মতো পেঁচিয়ে নিশ্চিন্ত মনে তৃষ্ণা মেটাচ্ছে। অভিসারী প্রেমিকার মতো এমন করে বস করেছে—গাভী একটুও নড়ছে না। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ব্যামাতীর শরীরে কেমন যেন একটা ভয় আর সাহসের মিশ্রণ সহসা গজিয়ে ওঠে। গাভীর ছটফটানি ওর সাহসকে ক্রমশ সামনের দিকে ঠেলে দেয়। কাঁপা কাঁপা হাতে উঁচিয়ে ধরে সুঁচালো বল্লমের ফলা।

বহুদিন পর আজ কালোনীর ঘুমটা যেন শেষ রাতে বেশ জমে উঠে। অথচ এমন ঘুমতো তার দীর্ঘ দিন চোখে আসেনি। পুবের জানলা দিয়ে গুটিগুটি রোদ দোল খাচ্ছে কালোনীর পায়ের কাছে। আড়মোড়া ভেঙে শাড়ির আঁচল জড়িয়ে নেয় বুকের সাথে। কি মনে করে দ্রুত উঠে আসে গোয়াল ঘরের দিকে। এতোক্ষণ গাভীটা বুঝি প্রস্রাব করে বাথিয়ে দিয়েছে।

গোয়াল ঘরের মেঝেই সামান্য আলো। সে আলোয় হালকা বাতাসে আমপাতার কুশিগুলো নড়ে উঠছে। একপাশে আলগা হয়ে পড়ে আছে গোয়াল ঘরের ঝাঁপ। কিছুটা সামনে এগুতেই, কালোনীর—কাজল ছোঁয়ানো চোখ দুটো আটকে যায় সমুখে পড়ে থাকা মানুষটির দিকে। পাশে দুটো কাক রোদের আলোয় কি যেন বলাবলি করছে। আলোর সাথে পড়ে থাকা ব্যামাতীর মুখের যেন একটা রসিকতা চলছে। কালোনীর

www.pathagar.com

চোখ আরও কঠিন হয়ে আসে। দেখতে পায়, নিঃসাড় দেহটা কাত হয়ে পড়ে আছে দুধেল গাভীর পেছনের দিকে। খোপের কবুতরগুলো কালোনীকে দেখে গলার পশম ফুলিয়ে তীব্র করুণ সুরে, বাকবকুম ডেকে ওঠে। এই লোকটার জন্যে একদিন সহদরা বোন পরপারে চলে গেলেও, আজ কেন যেন মাটিতে পড়ে থাকা মানুষটার জন্যে ওর সমস্ত দেহ-মন, সহসা কেঁপে ওঠে। 'দুলাভাই' বলে তীব্র জোরে চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু কেন যেন ওর গুমরে ওঠা অসহনীয় যন্ত্রণা, ভেতরের চাঞ্চল্যকে মুহূর্তে স্তব্ধ করে দেয়। যেন থেমে যায় নাড়ীর গতিময় স্পন্দন।

ব্যামাতীর পায়ে গজগজে ক্ষত। ক্ষতর মুখ থেকে পা বেয়ে নেমে গেছে শুকনো রক্তের দাগ। পাড়পড়শী মেয়ে মানুষগুলো দাঁড়িয়ে আছে ভিড় জমিয়ে। কালোনী ব্যামাতীর শুকনো রক্ত লেগে থাকা ক্ষতাক্ত পা জড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

ঘোর লেগে থাকা চোখে কালোনী স্পষ্ট দেখতে পায়, সোহরাব ব্যামাতীর সাদা ফ্যাকাশে ভাসাভাসা চোখে অসংখ্য ক্যানভাস হয়ে ফুটে উঠে—স্তূপ হয়ে পড়ে থাকা অজস্র জমির দলিল! দলিলগুলোর জলছাপে ভেসে উঠে—একটি বাংলাদেশ তথা দেশের আরও অসংখ্য ব্যামাতীর লোলুপ চোখের হিংস্র রাহু-দৃষ্টি!

www.pathagar.com

রঙিন কাচের আয়না

গত মাসেই পঁচিশে পা দিয়েছে মনিকা। কালের আবর্তে ফিরে আসে বসন্ত। নতুন করে মনিকার দেহমনে দেখা দিয়েছে বসন্তের মঞ্জুরিত উচ্ছল তরঙ্গ। বসন্ত মানেই বুঝি ফুটন্ত ফুলের বাহার। দক্ষিণা বাতাসের হৃদয় ছোঁয়া শিহরণ। দীর্ঘ কালের দমিত যৌবনের কলিতে এখনও কেউ আসেনি চঞ্চলা ওলি হয়ে। তবু মন বসন্তে হৃদয়ের মাধুরী মিশিয়ে স্বপ্নের মালা গাঁথে।

মনিকাদের বাড়ির পেছনে বাহারী ফুলের বাগান। মৌসুমের সব ফুলই বলতে গেলে ঠাঁই নিয়েছে এখানে। বাগানের মাঝ রাস্তায় সুন্দর একটি ঝাঁকড়া বাতাবি লেবুগাছ। গাছের নিচে বিছানো সাদা চাদর। হাটু ভেঙে বসে চা খাচ্ছে মনিকা ও তার ক'জন বান্ধবী। মেয়েগুলোর চোখ-মুখ থেকে কেমন যেন বসন্তের আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে। বোটা খসা লেবুফুল মাঝে মাঝে ঝরে পড়ে টুপটাপ মাথার উপর। কেঁপে উঠে উদাসী বুক! মেয়েগুলোর চেহারা ঠিক রাশ-রাশ সদ্য ফুটে থাকা ফুলের মতো। ঝরে পড়া পাঁপড়ীর মতো ছড়িয়ে দেয় হাসির স্রোত।

মনিকাদের বসে থাকার জায়গাটা বেদীর মতো অসংখ্য সাদা ফুলগাছে ঠাসা। গন্ধরাজ-জুঁই-বেলী-নীল অপরাজিতা ইত্যাদি ফুলের মিশ্রিত সুবাস। ছড়িয়ে দিয়েছে মোহনীয় আবেশ। চোখ-মুখ রাঙা মেয়েগুলোর মাঝে মনিকাকে মনে হচ্ছে ঠিক যেন বন-রাণী। বাতাসের দোলায়িত ফুল থেকে নাকে এসে ঠেকছে মাতাল করা মদির গন্ধ। আমপাতার ঘন পল্লবী থেকে ভেসে আসছে কোকিলের কণ্ঠ গড়িয়ে কুহুতান। গাছে গাছে আমের স্নিগ্ধ মুঞ্জুরির অপরূপ শোভা। মনিকার মনের কোণে কেমন যেন আনচান করে উঠে।

www.pathagar.com

আজ সকাল থেকেই সাঁজ সাঁজ রব ঢাকা শহরের এই দ্বিতল বাড়িটায়। মনিকার একমাত্র ভাই বিপ্লব। কম্পিউটার গ্রাফিক্সের কাজ ফেলে পুরো দিনটায় বাড়িতে ব্যস্ত। একটি মাত্র বোন মনিকা। ওকে আজ দেখতে এসেছে বর পক্ষ। যদিও বা এর আগেই পছন্দ করে গেছে আত্মীয়রা। আজ এসেছে বর স্বয়ং নিজেই। বিশাল ঘর। প্রায় হল ঘরের মতো। রুচির ছাপ স্পষ্ট। বেশ সুন্দর করে সাজিয়েছে বিপ্লব। দুটো বাহারী ফুলের টব স্টিল দরজার দুপাশে। সামনের চেয়ারে বসা মনিকা। কন্যাবেশী সলাজ নত মুখ। সুবিন্যাস্ত কেশরাশি কাঁধ ছুঁইয়ে ছড়িয়ে রয়েছে বিস্তির্ণ পিঠময়। ছিপছিপে দেহটা লতার মতো জড়িয়ে জামদানী। মাছের রক্তধোয়া পানির মতো লালচে রঙের ফুলতোলা শাড়ি। সবুজ লতা ফুলের ফাঁকে ফাঁকে ছড়িয়ে আছে জংলা গাছের মতো। কটকটে সবুজ রঙের ব্লাউজ। প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। বাঁকা ভ্রু, সরু তীক্ষ্ণ নাসা। মরুভূমির বালুঢেউ-এর মতো খাঁজকাটা কোমর। অনেকক্ষণ সেই ছায়াঢাকা নরম আলোয় দুচোখ ভরে মনিকাকে দেখলো ইমরান। মেয়েতো নয়—সাহারার গোলাপ। ইমরান চৌধুরীর বুকের ভেতর কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠে। মনে মনে ভাবে, পাশাপাশি এলাকায় থেকেও এমন সরেস জিনিশ আগেতো কখনও দেখিনি। নাম জিগ-গেস করতেই বিকেলের নির্জনতা ছিদ্র করে কানে এসে বিঁধলো ছোট্ট এটি কণ্ঠস্বর-মনিকা। সামান্য ক'টি প্রশ্নত্তোরের ভেতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম শুনে গাছ থেকে পিছলে পড়ার মতো চমকে উঠে ইমরান। মনে মনে বললো, ভার্সিটির নামটা বদলে বললেই বুঝি ভালো করতে।

ইমরান চৌধুরীর আরও কিছু বলবার ছিলো। কিন্তু ততক্ষণে মনের উচ্ছাস মনের অজান্তেই চুপসে গেছে। স্থিতু হয়ে যায় মনের আকাশ। বেশ কিছু ভাবনা স্মৃতিতে বড় বিধুর হয়ে উঠে। হীরের আংটিটা কয়েকবার নাড়াচাড়া করলো হাতে নিয়ে। বিদেশে থাকাকালীন কিনে ছিলো ওটা। দেশে গিয়ে পরিয়ে দেবে পছন্দের প্রথম মানুষটির অনামিকায়। শরীর উপচানো রূপ। মেয়েটিকে পছন্দও হয়েছিলো। কিন্তু যখন শুনলো ওর খুব জানাশুনা ভার্সিটির ছাত্রী সে, মনের সমস্ত পছন্দের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো লুকিয়ে থাকা সন্দেহ! সেখানকোর অধিকাংশ ছাত্রীই খুইয়েছে সম্ভ্রম। ধর্ষিতার ছোপছোপ কালো দাগ চরিত্রের সাথে পশমের মতো মিশে আছে। ও যখন দেশে ফিরে নিজেই একটা প্রাইভেট ফার্ম খুলে বসলো, ঠিক সে সময়েই ভার্সিটির অবাক করা ব্যাপারগুলো ঘটতে থাকে। পঁচিশেরও অধিক তরুণীর সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ চিরদিনের জন্য কেড়ে নেয় ওর এক সময়ের সাড়া জাগানো বন্ধু—কুদ্দুস। মেঘে ঢাকা তারার মধ্যে এও তো একজন হতে পারে।

বার বার মনে পড়ছে নম্র সলজ মেয়েটির চেহারা। ছোট বোন শ্যামলী যেমন বলেছিলো, ও তার চেয়েও বেশী সুন্দরী। কিন্তু মনের পর্দায় জমে থাকা মেঘ কী করে সরাবে সে? শুধু কি সহপাঠীরায় ওদের সর্বনাস করেছে? না। অভিভাবকরা যেটা

www.pathagar.com

কল্পনাও করতে পারে না, উচ্চতম প্রতিষ্ঠানগুলোয় সে সব বাস্তবে ঘটছে। কিছু কিছু শিক্ষক ছাত্রীদের ইনকোর্স-টিউ টোরিয়াল মার্কস-এর বিনিময়ে চুষে নেয় টান-টান শরীরের জমে থাকা প্রথম যৌবন। অনেক মধ্য বয়সের শিক্ষকও ছাত্রীদের পীড়ন করছেন সম্ভগ করার জন্যে। আবার কখনও কখনও কিছু শিক্ষক-ছাত্রীর মধ্যে স্বভাবতই একটা সহজাত সম্পর্ক গড়ে উঠে। এভাবে সংখ্যাতীত শিক্ষক পীড়ন করে, শোষণ করে, ছাত্রীদের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে উপভোগ করার চেষ্টা করেন। ফোর্থ ইয়ারে পড়ার সময় এমনি এক কালগ্রাসের খপ্পরে ও হারিয়েছে ওর জীবনের প্রথম বান্ধবীকে। এরপর দেশ-বিদেশ অনেককিছু ঘুরেও ভালো বাসতে পারেনি আর কোনো মানবীকে।

॥দুই॥

এই মাত্র ঘটক তোরাব আলী এসে পা দিলো মনিকাদের বাড়ির উঠোনটায়। সামনে এসে বললো, মেয়ে ওদের পছন্দ, তবে ঐ একটি ব্যাপারেই শেষ পর্যন্ত বিয়েটা ভেঙে গেলো। দক্ষিণের বারান্দায় গোসলের ভেজা কাপড় মেলে দিচ্ছিলো মনিকা। তোরাব আলীর অসহায় মুখোভঙ্গির কথাগুলো কানে আসতেই যন্ত্রণায় বুকটা এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেল। শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত সিরসির করে উঠে নেমে গেল নিচের দিকে।

মনিকার চোখের জলে ছলকে উঠা বিদ্যুতের আভাস। হাতটা বুকে ঠেকিয়ে বলতে লাগলো, মরে যেতে পারলেই বুঝি ভালো হতো। রাগে বার কয়েক বুক চাপড়ে ফাল ফাল করে ছিঁড়ে ফেললো বুকের সাথে লেপটে থাকা ওড়নাটা। চেঁচিয়ে বললো, আমি অপয়া, অপবিত্র, অলুক্ষণে। এমন জীবন কেন হলো আমার? পাগলের মত মাথার চুল ছিড়তে লাগলো। পাশের ফাঁকা পালঙ্কটাতে আছড়ে পড়ে ভাবতে লাগলো, চরিত্র জিনিশটা ছেলেদের সত্যিই ভারি অদ্ভুত! একটি সুবাসহীন ফুল দিয়ে বাগানের সবফুলকে বিচার করে। ওর রূপ ছিল সত্যিই অপরূপ। বিশেষ করে ভারি নিতম্ব দুলে হেঁটে চলা পাড়ার ছেলে-ছোকরাদের মাথা ঘুরে যেত। স্বভাবতই আর পাঁচ জন মেয়ের চেয়ে ও একটু ভিন্ন ভাবে চলা ফেরা করতো। পথ চলতো শরীরের বাড়ন্ত অংশগুলোকে বেশ ঢেকে ঢুকে। তবু বয়সের ভার বলে কথা। এত সতর্কের পরও উন্মুক্ত যৌবন বস্ত্রের বাধঁ ভেঙে যেন, ঠিকরে বেরুতে চাই। তাছাড়া নারী জীবনের এটাও এক ধরনের সার্থকতা। এতো দিন যে স্বপ্নের মানুষটির ছবি আঁকতো, মুহূর্তের কালবোশেখি যেন জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার সব কিছু উড়িয়ে দেয় ছাইয়ের মতো। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে যখন সে প্রথাকে মেনে নিয়ে কুমরীত্বের অবসান চেয়েছে, ঠিক তখনি ওর জীবনে ঘটলো চরম বিপর্যয়। ইমরান নামের অভিজাত মানুষটি একটি বারও ওকে বোঝার চেষ্টা করলো না। খেয়াল করলো না ঘরের দিকে। ওরও তো বোন আছে। নাম শ্যামলী। এক সময় ঘনিষ্ট বান্ধবী ছিলো মনিকার। ওরা তখন কলেজে পড়তো। হঠাৎ

www.pathagar.com

একদিন সবাইকে অবাক করে দিয়ে ফটো সুন্দরীর প্রথম স্থানটা দখল করে নেয় শ্যামলী। সেই থেকে ওর পথ চলা মডেলিং আর অভিনয়ে।

সহসা আজ অনেকদিন পর মেঘ করলো আকাশে। চারদিকে সাঁ-সাঁ বাতাস। রোদ উঠলো দীর্ঘ বিরতির পর। মনিকা পেছন দরজা দিয়ে পা পা করে বাগানে এসে দাঁড়ালো। অদ্ভুত সোঁদা গন্ধটা মাটির ভেতর থেকে ঝাঁপিয়ে বেরিয়ে আসে। বিরহী খোলা চুল বাঁধতে বাঁধতে বিকেল হয়ে এলো। ঝিরঝিরে হাওয়ায় গন্ধটা বার বার নাকে এসে বিঁধছে। দেখতে দেখতে কেমন করে যেন বিকেলটা সরে গেল দ্রুত পায়ে। সূর্যটা নেমেয় গেলো নদীর কিনারে। যেন ঝাঁপ দেবে নীল পানির গভীরে।

মনিকা একা একা বসে আছে শব্দহীন, চুপচাপ। মাথাটা টেবিলে ঈসৎ ঠেকিয়ে। ফাগুনের রোদ্দুরে জানালার ওপাশে ঝলমল করছে অর্জুনগাছ। অর্জুন শাখার ফাঁকে ফাঁকে ওঠা-নামা করছে কয়েকটি দোয়েল। সেই দিকটায় চেয়েছিলো মনিকা। সহসা দরজার চৌকাটে পায়ের শব্দ। সামনে এসে দাঁড়ালো বিপ্লব। খুব সন্তর্পনে তাকালো মনিকার আশ্চর্য শুকনো চোখের দিকে। সে অধোমুখ হেলে থাকা বেচারির মুখের দিকে চোখ তুলে চাইতে পারছিলো না। মুখটা নিউজের খসখসে কাগজের মতো রক্তশূন্য। ভাইকে দেখেও নিস্প্রাণ আসবারের মতো নীরব হয়ে বসে রইল। বিপ্লব ভারি গলায় বললো, রাগ করিসনে মনি, দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে।

কি বলতে চাও ভাইয়া, বলে ডুকরে কেঁদে উঠলো মনিকা।

মনিকার কথায় ব্যথার সঙ্গে অশ্রু ঠেলে উঠলো বিপ্লবের চোখে। তুই ভেবেছিস এমনি এমনি ওকে ছেড়ে দেবো? আমার একমাত্র বোনের চোখ গলিয়ে জল ঝরিয়েছে, ওরও একটা বোন আছে তোর মতো। নাটক ফাটক করে বড়োয়। দেখে নিস ওর মিথ্যা অপবাদের একটা বিহিত আমি করেই ছাড়বো।

॥তিন॥

অবেলার ভাতঘুম ভেঙে শ্যামলী দেখলো ঘড়ির কাঁটা পাঁচটার ঘর ছুঁইছুঁই করছে। আজ একটা বড় কোম্পানীর মডেলিং হবে। স্পটে পৌঁছনোর সময় ছিলো পাঁচটা, অথচ এখানেই সময় হয়ে এলো। শরীরটা যেন ম্যাজম্যাজ করছে। দ্রুত সাওয়ারের ঠান্ডা পানিতে গোসলটা সেরে নিলো শ্যামলী। তাকিয়ে থাকলো ক'মুহূর্ত আয়নায় ভেসেওঠা নিজের শরীরের দিকে। ঈসৎ নতো বুক সুললিত সাবলীল পদ্মকলির মতো উপরমুখি হয়ে চেয়ে আছে। মনের ভেতর জেগে উঠে এক ধরনের প্রশান্তির সজিবতা। আহ্লাদে কিশোরীর মতো বুকটা সামনের দিকে টান করে, কোমর বাঁকিয়ে চুলগুলো ঝাড়া দিলো ক'বার। শরীর থেকে ফুরফুর করে বেরুচ্ছে সুগন্ধি সাবানের ঘ্রাণ। সায়া-ব্লাউজের পর শরীরে চড়ালো মধুছন্দা কাতান। রঙিন শাড়ির পাড়ে আলোর ছটায়, মেদহীন বাঁকানো কোমর ঝিলিক দিয়ে উঠে।

www.pathagar.com

শ্যামলী সুটিং স্পটে পৌঁছে রীতিমত অবাক! গোলটেবিলটার দিকে ঝুঁকে পড়ে কি যেন দেখছে সবাই। কেউ কেউ মিটমিট করে হাসছে ওকে আসতে দেখে। মনে হচ্ছে জীবনে ওরা প্রথম দেখছে ওকে। সামান্য কাছে আসতেই ছ'সাত জন টেবিলটা ফাঁকা করে দাঁড়ালো। সিনিয়র এডিটর লতিফভাই একটি ইংলিশ ম্যাগাজিন ধরিয়ে দেয় শ্যামলীর হাতে। শ্যামলী খুশি হয়ে উল্টাতে থাকে ম্যাগাজিনের রঙিন পাতাগুলো। সহসা শেষ প্রচ্ছদের "বার্থ কন্ট্রল পিল"র বিজ্ঞাপন দেখে চোখ দুটো থেমে যায় স্থীর হয়ে। শ্যামলী নিজের চোখকে নিজেই বিশ্বাস করতে পারছেনা। ওর রানিং ক্যারিয়ারে কে এমন চুন-কালি একেঁদিল? ক্যামরাম্যান যেমন সট চান ঠিক তেমনটিই দিয়ে আসছে বরাবর। একবার ওড়না ছাড়া উদোম বুকে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে সামান্য আপত্তি তুলেছিল। নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের সেদিন ক্ষোভের অন্ত ছিলনা। সেই থেকে শ্যামলী ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে আর তেমন আপত্তি জানাই নি। তবে ওর এমন সর্বনাশটা কে ঘটালো? শ্যামলী পূনরায় চোখ রাখলো বিজ্ঞাপনের পাতায়। পুরোটায় ওর ছবি। সম্পূর্ণ নগ্ন। শরীরে থাকা বলতে চার আঙুল চওড়া প্যান্টি আর ব্রা। বুকের সন্ধিস্থল সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। এক হাত অন্য একটি পুরুষের বাহু জড়িয়ে, অপর হাতে বার্থকন্ট্রল পিলের সুদৃশ্য মোড়ক।

অনেক চেষ্টার পর বিজ্ঞাপনের জটিল রহস্য উদ্ঘাটনে সক্ষম হয় শ্যামলী। কলেজ জীবনের বান্ধবী মনিকার ভাই নির্মাণ করেছে এ ডিজাইনটি। আজকাল কম্পিউটারের বদৌলতে রাতকে দিন বানিয়ে ফেলছে মানুষ। রানিং ক্যামেরার সাথে অত্যাধুনিক কম্পিউটারের সমন্বয়ে চিত্রটা উপস্থাপন করেছে গ্রাফিক্স অপারেটর বিপ্লব। বিদেশী পর্ণ ছবির মাথা কেটে শ্যামলীর একটি হাসি মুখ ছবি পর্ণ ছবির কাঁধে বসিয়ে দেয় অতি সুকৌশলে। কাজটা এতোই নিঁখুত যে ধোরাবার কোনো যো নেই। দেখে মনে হবে এমন অশ্লীল ছবির পোজ দিয়েছে-সয়ং শ্যামলী নিজেই।

সারাটা রাত একা একা জ্বলে পুড়ে খাক হলো শ্যামলী। মন চাইলেও কাউকে বলতে পারছেনা অন্তর্দাহের কথা। অথচ মিডিয়ার মাধ্যমে সবাই জেনে গেছে ও কতো নিচ। সকলের চোখে পরিষ্কার, রুচির কতো অধোপতন ঘটলে মানুষ এমন নগ্ন চিত্রে নিজেকে উপস্থাপন করতে পারে। একটু পরেই হয়তো আসতে থাকবে টেলিফোনের পর টেলিফোন। ওদের-ই কিছু সাহসী হাত হয়তো অস্বস্তিতে জড়িয়ে ধরবে, চিঠির অশ্রাব্য বাক্য বানে।

দ্বিতল বাড়িটার সামনে এসে ডোরবেল-এ চাপ দেয় শ্যামলী। সহসা একটা মোহনীয় সুবাস বয়ে যায় সামনে দিয়ে।

দরজা ঠেলে বেরিয়ে আসে বিপ্লব। চেহারায় ছুঁয়ে আছে অদ্ভুত দৃষ্টি। শ্যামলীকে নাটক ছাড়া তেমন এটা দেখেনি ও। শ্যামলী চাপা স্বরে বললো, আমার কিছু কথা আছে তোমার সঙ্গে।

www.pathagar.com

সে কি! ভেতরে চলো, বসে থেকে আলাপ করা যাবে।
শ্যামলী গলা চড়িয়ে বললো, উমহুঁ, আজ অন্তত বসার জন্যে আসিনি।
এভাবে দাঁড়িয়ে থেকে ...
না, ওপাশটায় গেলেই চলবে।
বাড়ির পাঁচিলঘেঁষা বাগানের ওপাশটায় গিয়ে বসলো দু'জন। উজ্জ্বল গোধুলীর আলো এসে পড়ছে ওদের চোখ-মুখে। দুপাশে দুটো কৃষ্ণচুড়া রাশ রাশ ফুল ঝরিয়ে নিচের বৃত্তটা লাল গালিচার মতো ছড়িয়ে রেখেছে। বাসন্তি হাওয়ায় মোহনীয় ঘ্রাণ বার বার নাকে এসে ঠেকছে। শ্যামলীর কৃত্রিম উদাসী চোখ ঝাউ গাছের ঝুলে থাকা পাতার ফাঁকে। এ সুযোগে বিপ্লব ওর সতর্ক দৃষ্টি ছড়িয়ে আড়চোখে ক'মুহূর্ত শ্যামলীকে দেখে নেয়। অভিনেত্রী সুনেত্রার মতো বিশালাকৃতির টান-টান চোখ। থুতনীর নিচে আশ্চর্য সুন্দর ভাঁজ—যা চোখে পড়ে না সচারচর। চোয়াল দুটো মেকাপ ছাড়াই পানিতে ভাসা পদ্মের মতো কোমল। ভাঁজহীন ফর্সা ত্বক। চিক্‌চিকে লাবন্য ঝরা ঠোঁটে হালকা লিপস্টিকের উপর লিপসান বুলানো। হাঁসের গ্রীবার মতো বাঁকানো কোমর। বিশেষ ভাবে তৈরী নীল গেঞ্জি সেই সঙ্গে উরুর সাথে সেঁটে থাকা জিন্স। কাঁধে ঝোলানো সুতির ব্যাগ। নীল গেঞ্জীর আনকোরা ডিজাইন, অন্য রকম এক সৌন্দর্যের নীলাভ ছটা ছড়িয়ে আছে শরীরময়। নীল বুকে নেই কোনো বাড়তি কাপড়ের টুকরো। আড়াআড়ি ভাঙা নারকোলের দুটো ফালির মতো উদ্ভাসিত বুক।
বিপ্লব এতোক্ষণ বিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে দেখিছিলো শ্যামলীকে। শ্যামলী এবার চোখ নামিয়ে গাঢ় স্বরে বললো, তুমি লোকটাকে ভালো জানতাম, এমন মিনমিনে হলে কবে থেকে। পত্রিকার এ্যাড়ে যে কাজটি করেছো বাস্তবে কি এর প্রতিশোধ নিতে চাও?
প্রতিশোধ নিতে চাইলে এর চেয়ে আরও কঠিনভাবে নিতে পারতাম। শুধু সামান্য আঁচড় লেগেছে-এই যা।
সামনের ঢেকে থাকা চোখ থেকে চুলের গোছা সরিয়ে শ্যামলী বললো, সমাজের চোখে একজন অভিনেত্রীকে অশ্লিলতার রঙে সম্পূর্ণ নগ্ন করে দেখিয়েছো। আর একে তুমি সামান্য বলছো? তাছাড়া অভিনয় ছাড়াও আমার একটা ব্যক্তিগত ভবিষ্যত আছে।
বিপ্লব কণ্ঠে রোষ ছড়িয়ে বললো, ভবিষ্যত! সমাজের কেউ তোমাকে না নিলে আমি তোমাকে গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু মনিকা? ওর অবস্থা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে, খোঁজ নিয়োছো?
কিছুক্ষণ থেমে থেকে বিপ্লব অজানা এক বিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে দেখছিলো শ্যামলীকে। চোখ মুখে শ্যমলীর স্তম্ভিত আবেগ যেন দিশে পাচ্ছে না। গলায় চাপা উত্তাপ ছড়িয়ে বলে উঠে, এসব কথা আমায় বলছো কেন?
শোনাতে তোমাকে চাইনি। আজ তুমিই বলতে বাধ্য করেছ তোমাদের সভ্যতার আড়ালে, নিগ্রীহ নারীর কথা।

www.pathagar.com

চিপা প্যান্টের উরুর কাছের ভাঁজ ঠিক করতে করতে শ্যামলী বিমূঢ় ভঙ্গিতে দুচোখ বন্ধ করে ফেলে কিছুক্ষণের জন্যে। দৃষ্টি নিচের দিকে রেখে বললো, আমার জীবনে বর্তমান বাস্তব টুকু খেয়াল করেছ?

তুমি জানোনা কল্পনার চেয়ে বাস্তব কত কঠিন হয়। তুমি এও জানোনা দেশের জন্যে যুদ্ধ করে বাবা আমাদের এতিম করে রেখে গেছে। মনিকা স্বভাবগত ভাবে খুব লাজুক। তোমার ভাই সেখানে ওকে বলাৎকার করেছে মানুষিক ভাবে। খ্যাতির ইঁদুর-দৌড়ে নিশ্চয় এগিয়ে তোমরা, কিন্তু মনিকা? ওর বুকের ক্লেদাক্ত ব্যাথা চোখের কোন বেয়ে সারাক্ষণ নিঃসাড়ে ঝরে পড়ে। একটি বার ভেবেছো তোমার-ই সেই ভেঙেপড়া বান্ধবীর কথা?

ভাই কাজের মানুষ। সারাক্ষণ কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। প্রচলিত সংবাদ গুলোই বুঝি ওর ভেতর এমন চিন্তার প্রয়াস যুগিয়েছে।

দেখুন, ইদানিং কাজ বুঝলেই চলে না। অকাজ নামের এক ধরনের পদার্থ কাজের সঙ্গে থাকে, সেটাও বুঝে উঠতে হয়। আর এদুটোর ভেতরের জিনিশটা আপনার ভাই বুঝে উঠতে পারেনি। পৃথিবীটা ওনার কাছে রঙিন কাচের দর্পন হলেও, বিনে দোষে উদোর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে চড়িয়ে একটি সরল মনের গভীরে প্রবেশ—আর যার হোক সহজ কাজ নয়।

ভাইয়া তো তেমন কিছু বলেন নি।

মৃত্যুর জন্যে পয়জিন পরিমানে খুব বেশী লাগে না, অল্পতেই হয়।

তার মানে?

ইমরান ঘটককে সরাসরি বলেছে, মনিকার ভার্সিটির অধিকাংশ মেয়েই ধর্ষিতা। এমন কি ও নিজেও। ওর সার্টিফিকেটও নাকি সেচ্ছাই দেহদানের ফসল। ঘটক যখন আমার পীড়াপীড়িতে কথাগুলো বলছিলো, মনিকা পাশের বারান্দা থেকে সব শুনেছে।

সতি বলছো?

মিথ্যে বলার অভ্যেস আমার নেই। একজন ছেলে একটি মেয়েকে দেখবার পর বিয়ে না-ও করতে পারে। কিন্তু সরাসরি চরিত্রের উপর আক্রমণ, এটা সবাই সহ্য করতে পারে না।

কিন্তু...

তাছাড়া গার্জেন পক্ষের এক'শ ভাগ পছন্দের পর তোমার ভাই এলো ইনগেজমেন্ট পরাতে। গাড়ির বহর ধুলো উড়িয়ে যাবার পর কেমন করে যেন পাড়ায় ছড়িয়ে পড়ে মুখোরচক খবর। কানে আসে, চেহারা আর চরিত্রে কলঙ্কের ছাপ দেখতে পেয়ে বরপক্ষ চলে যায় তাচ্ছিল্ল করে। ঘটনা চেপে গিয়ে রটনা ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে। সেই থেকে ওর বিশাল জগৎটা এসে বন্দি হয় ছোট্ট একটি কুঠরিতে।

www.pathagar.com

শ্যামলী নীরবে ঘামছিলো। গ্রীবার নিচে স্বভাব সুলভ ভঙ্গিতে রুমাল চালিয়ে ভেজা গলায় বললো, মানুষ এতো নিচে নামতে পারে?

শুধু তাই-ই না। মনিকা ওর মনের কথা সহ্য...। সহসা কাজের মেয়েটি হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললো, মনিকা আপাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ড্রইং রুমের দরজা ভেতর থেকে আটকানো। হঠাৎ গ্যাস সিলিন্ডার বাস্ট হওয়ার মতো চমকে ওঠে বিপ্লব। ছুটে আসে বাড়ির ভেতর। শ্যামলীও পেছন পেছন এসে দাঁড়িয়েছে। দোতলায় উঠেই যেন প্রচন্ড ধাক্কা খেলো বিপ্লব। দরজা খুলে ভেতরে যা দেখলো দুজনেই রীতিমতো হতবাক! কাজের মেয়েটা আপা-গো বলে ডুকরে কেঁদে উঠল। অভাগী নিজের শাড়ির ফাঁসে নিজেই ঝুলছে।

কাল প্রবাহে কা'টা মুহূর্ত কেমন উদাসভাবে কেটে যায়। মুহূর্তে আঁধার জমে উঠে শ্যামলীর মুখে। বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে ভয়ঙ্কর মনস্তাপ! শ্যামলীর ঝাঁঝালো কণ্ঠটা মুহূর্তে নেমে যায় খাদালো কোটরে। আশ্চর্যরকম ব্যর্থ মনে হয় নিজেকে। সামনের ঠান্ডা হাত দুটো জড়িয়ে ধরে কান্না জড়িত কণ্ঠে বলতে লাগলো, আমাকে ক্ষমা করো মনিকা। আজ সবাইকে ছোট করে তুমিই বড় হয়ে চলে গেলে। সত্যিই তুমি মহান! এক মহিমান্বিত পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী!

সহসা শ্যামলী আর বিপ্লবের চোখ পড়ল টেবিলে। ছোট্ট একটি চিরকুট। বিপ্লব চিরকুটটি হাতে নিয়ে ভাঁজ খুললো, 'ভাইয়া, পৃথিবীতে তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই। তোমাদের সব কথা আমি আড়াল থেকে শুনেছি। তবে পর্ণ ছবি দিয়ে শ্যামলীর উপর এমন প্রতিশোধ নেয়া ঠিক হয়নি তোমার। কারণ, একটি অপরাধ দিয়ে আর একটি অপরাধ কখনই মুছে ফেলা যায় না। ইমরান যায়-ই করুক, হাজার হোক শ্যামলী আমার বান্ধবী। যদিও আমার ব্যাপারে শ্যামলীর একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল। আমি এসেছিলাম পৃথিবীর রূপ-রস-ঘ্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকতে। কিন্তু পৃথিবীর রস-কষহীন মানুষগুলোর জন্যে সে সব আর হয়ে উঠল না। আমি থাকলে হয়তো তোমরা হাবিল-কাবিলের মতো প্রতিশোধের নেশায়, নিজেদের অপূরণীয় ক্ষতি ডেকে আনতে। এর পরেও কী আমার আর কোনো প্রয়োজন আছে?

—মনিকা।

www.pathagar.com

অদৃশ্য নিয়তি ও শিমুল গাছ

সারা রাতের মনমস্কর হৃদয়ের চাঞ্চল্য আর প্রাণের উচ্ছ্বাস মুহূর্তে যেন সলিমের জীবন থেকে মুছে গেল। অনাকাঙ্ক্ষিত ঝড় গাছের মগডালটি মটকালে যেমনটি হয়।

ব্যাপারটা তবু খোলসা হচ্ছে না। আরেকটু সহজ করে বলা দরকার। সলিম সুলতানাকে নিয়ে গলির পাশের কুয়োতলায় আসে। পূর্ণিমার চাঁদ শিমুল গাছের ফাঁক গলে তখনও মিটিমিটি হাসছে। রূপোলী আলোর গুঁড়ো সুলতানার মুখের অবয়বকে আরও ঝকমকিয়ে তুলেছে। কুয়োতলায় এসেছে দু'জনেই গোসলের জন্যে। হঠাৎ সলিম চাঁদের আলোয় চুম্বকীয় আবেশে কাছে আসে। সুলতানা তখন উবু হয়ে পানি-ভর্তি বালতি রশি টেনে উপরে তুলছে। সলিমের সোহাগাশ্রিত দুষ্টুমিটা এই সুযোগে লকলকিয়ে বেড়ে ওঠে।

পেছন থেকে সলিম সুলতানার কোমল গালদুটো দ্রুত চেপে ধরে। ব্যাস। ভারসম্য রক্ষায় ব্যর্থ সুলতানা, পানির বালতিসহ বোঁটাছেড়া কুমড়োর মতো কুয়োতে পড়ে যায় ঝপাঙ করে।

এই অসহায় মুহূর্তেও লোকমুখে শোনা কথাগুলো সহসা সলিমের মনে পড়ে। কুয়োর নিচে নাকি অক্সিজেন তেমন থাকে না। আর মানুষ পড়লে খুব জোর দু'এক মিনিট—এর বেশী বাঁচে না।

সুলতানার জন্যে মনটা ভীষণ রকম নিশপিশ করছে সলিমের। কিছু একটা বুঝে ওঠার আগেই পাশের শিমুল গাছ থেকে একটি ছায়া উড়ে এসে যেন ওর পাশাপাশি দাঁড়ালো। পরিছন্ন সাবলীল কণ্ঠ এসে ওর কানে বিঁধছে, সলিম! তুই এখনও দাঁড়িয়ে

www.pathagar.com

আছিস। যে পড়েছে সেতো মরেইছে। মিছেমিছি আফসোস করে কি লাভ? কি, বউ-এর জন্যে খুব মায়া হচ্ছে বুঝি? লালঘর যেতে না চাইলে জ্বলদি কেটে পড়।

দুই.

কণ্ঠটা যেদিক থেকে আসছিল সেদিকে তাকালো বটে সলিম—কিন্তু তেমন কিছু দেখতে পেলনা। তবে একটা জিনিস আবছা আবছা চোখে পড়ে। সাদা ধোঁয়ার মতো কি যেন একটা বাতাসের সঙ্গে শিমুল গাছের দিকে উড়ে যায়। এক সময় ক্লান্ত চোখ সলিমের নিচের দিকে ফিরে আসে।

একদিকে নিজের বউ-এর জন্যে ভেতরে দাপাদাপি—অন্যদিকে শিমুল গাছের অজানা রহসাবৃত ভয়! অদৃশ্য কথাগুলো শুনলো বটে—তবে কে বললো সনাক্ত করা মুহূর্তে দুস্কর হয়ে ওঠে। তাহলে উপায়?

তিন.

সেই যে পূর্ণিমার শেষ রাতে শিমুল গাছের নিচ দিয়ে সলিম পালালো, গ্রামে আর ফেরেনি। গ্রাম কেন, এতল্লাটে ওর ছায়া আর কখনও কেউ দেখেনি। একদিকে আতঙ্ক অন্যদিকে ভয়! সলিমের মতো সাধারণ চাষীর ঘরের সন্তান কী এতো ভার বইতে পারে? নিজের বউকে চুপিসারে সোহাগ করতে গিয়ে এতো কিছু ঘটবে, ওকি কখনও ভেবেছিলো?

না।

তাহলে কেন এমন হলো?

ভিনদেশী এক সেলুনে বসে সলিম আয়নার দিকে নাগাড়ে তাকিয়ে থাকে। দীর্ঘক্ষণ স্থিরচোখ চেহারার দিকে। না। কথাটা ঠিক হলো না। চেহারার দিকে নয়। ওর কপালের দিকে। চার আঙুল কপালকে ও বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। মনের অজান্তে ভেতরের কাগজে কপালের কাব্য জেগে ওঠে। ... কপালে যা লেখা ছিল এতো দূরে এসেও তা খণ্ডাতে পারলো না। সুলতানা মরতেও পারে, নাও পারে। আর যদি না মরে, তাহলে ওর ভয়ও থাকবার কথা নয়। তাহলে কেন পরবাসী কষ্টের জীবন এমনভাবে পথে-ঘাটে, জেল-হাজতে কাটাতে হচ্ছে?

চার.

জেল-হাজত?

হ্যাঁ।

একটা বিশেষ কাজে সলিম বেশ পারদর্শী ছিল। বড় বড় শিমুল গাছে আঙটা ছাড়াই অনায়াসে উঠে যেতে পারতো। গ্রামের সমস্ত শিমুল গাছের তুলার ফল নামমাত্র মূল্যে কিনে নিতো। নিজেই, বড়ছেলে সরাজকে গাছের নিচে রেখে সমস্ত তুলা পাড়তো। সেই তুলো শুকিয়ে ভর বছর বিক্রি করতো।

সেই সলিম আজ স্ত্রীর নিশ্চিৎ মৃত্যু জেনে পালিয়ে আসে রোসুলপুর গ্রামে।

www.pathagar.com

কিন্তু উপাই?

গাছে ওঠা ছাড়া কোনো কাজই জানে না সে। ক'দিন থেকে সুলতানার জন্যে মনটা ভীষণ খারাপ করছিল ওর। ক্ষুধাটাও কেমন চনমনিয়ে ওঠে। থেকে থেকে দলা পাকিয়ে মোচড় দেয় পেটের নাড়িগুলো। এমন মুহূর্তে সুলতানা পাশে থাকলে, কেমন করে যেন টের পেতো। যা পেতো তাই হাঁড়ি-পাতিল মুছে, এমন কি নিজের জন্যে রাখা খাবারটুকুও ওর মুখের সামনে তুলে ধরতো। সেই সুলতানাকে কুয়োতে ফেলে স্বার্থপরের মতো সে চলে এলো?

তা ছাড়া না এসে তো উপাইও ছিলনা।

আর এটাই হয়তো ওর হাজত থাকবার মূল কারণ।

একসময় ভাবনা থেকে ফিরে আসে বাস্তবে। সামনে ধু-ধু মাঠ। এর পর মাঠান জমি মাড়িয়ে প্রাইমারী স্কুল। স্কুল-ঘরের পেছনে পাকা ফল ভর্তি শিমুল গাছ। এতোক্ষণে ওর চোখ দুটো তৃপ্তির আলোয় চক্‌চক্ করে উঠে। পাকা ফলের সব তুলো পড়ে যাচ্ছে—অথচ কেউ চোখ তুলেও দেখেনা। সমস্ত ফল পেড়ে পুটলী করে বাঁধে গায়ের চাঁদরে। হঠাৎ পাঁচ বছরের একটি শিশু কাঁদতে কাঁদতে ওর দিকে এগিয়ে আসে। দেখে ওর কোলের শিশু মন্টুর স্মৃতি ভেসে ওঠে। বাচ্চাটাকে দেখে সলিমের ভীষণ মায়া হয়। জিগ্-গেস করে, কাঁদছো কেন বাবা, কি হয়েছে?

অরা হামাকে খেলটে লেয় না।

ওরা কারা?

টুমন ভাইয়া। আমাকে ঢমক ডিয়েছে।

ঠিক আছে তুমি আমার সঙ্গে খেলা করো, কেমন?

টোমার কি গুঠি আছে?

কেন নেই, এই যে, শিমুলফল আছে।

খেলা শেষে একসময় বাচ্চাটাকে কিছু কিনে দিতে দোকানে আসে সলিম। ব্যাস। ছেলেধরা সন্দেহে এলাকার লোকজন ইচ্ছেমত পেটালো। সলিম অনুভব করে, মেরুদণ্ডের অস্থি গুঁড়ো হবার উপক্রম। অসংখ্য মারের আঘাতে তবু রক্ষা পেলনা নিস্তেজ শরীর। এরপর বছর খানেক জেল-হাজতে কাটলো।

পাঁচ.

সুলতানা কি শেষ পর্যন্ত মরেই গেল?

না। সুলতানা মরতে মরতেও বেঁচে গেছে। আক্কাশ হাজী নামাজ পড়তে উঠে সুলতানার চিৎকারে প্রথম টের পাই। অমন নাদুস নুদুস মেয়ে ওপরে তোলা কী বৃদ্ধ হাজীর কাম? দশজন জড়ো করে বালতীর রশি নামিয়ে কোনো রকমে উপরে তোলে।

www.pathagar.com

সেই নাদুস নুদুস শরীর আর নেই। ক্ষুধার জ্বালা, স্বামীর চিন্তায় ক'দিনেই পোড়া উস্কাঠি-রঙ ধারণ করেছে। কিন্তু এভাবে কী দুটো সন্তান নিয়ে কারও জীবন চলতে পারে?

না। সুলতানার জীবনও স্থবির হয়ে যায়নি। সমিতি করে। "সূর্যমুখি নারী কল্যাণ সমিতি।" এন জিওদের সমিতি কষ্টের হলেও সুলতানা হাসি মুখে মেনে নেয়।

ছয়.

বছর খানেক হলো সুলতানা লোন নিয়ে গাভী পোষে। শরীরের মরা চামড়ায় আবার লাবণ্য ফুটে ওঠে। ত্বকের চিকচিকে ভাবটা এমনিতেই চোখে পড়ে। কোমরের উপর দু'তিনটে ভাঁজ পড়ে অনায়াসে। কাজ করার সময় কপাল ও নাকের ডগায় বিন্দ বিন্দু ঘাম জমে ওঠে। বিন্দু ঘামের ঝলকানী পরিদর্শনে আসা এনজিও অফিসারের, উষ্ণ রক্ত মুহূর্তে ছল্‌কে ওঠে। মোলায়েম সুরের মিষ্টি কথায় সুলতানার পাশে ঘন হয়ে বসে। অনন্তকাল এমন দৃশ্য চোখে দেখার মনে মনে স্বপ্ন দেখে।

সাত.

গ্রাম ছাড়া সাত বছর হলো সলিমের।

শুধু কি গ্রাম?

না

বাড়ি-কুয়ো-শিমুলগাছ-গাছের ছায়া-পূর্ণিমার চাঁদ, আরও কতো কী।

আর সুলতানা?

হ্যাঁ। সুলতানা শুধু সুলতানাই নয়। সুলতানার মন-শরীর-যৌবন-ভালোবাসা সবকিছুই সে হারিয়েছে।

আট.

জেলখানা থেকে আজই ছাড়া পেল সলিম। এক বছরের জেল-জীবন। শরীরটা কেমন যেন জঙ ধরে গেছে। বিশাল লোহার গেট পেরোয়ে খালি পা ছোঁয়ালো পৃথিবীর সবুজ ঘাসে। ঘাড় তুলে উপরের দিকে তাকায়। প্রাণ ভরে আকাশটাকে দীর্ঘক্ষণ দেখে। মনে হয় নতুন পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ পরখ করে নিচ্ছে।

ঠিকানাবিহীন পথ চলতে চলতে সহসা একটা শিমুল গাছের সামনে থমকে দাঁড়ায়। পথচলা ক্লান্ত শরীর গাছের ছায়ায় এলিয়ে পড়ে। পুটলিটা মাথার তলে কখন যে ঘুমিয়েছে নিজেও জানে না। ঘুমের ঘোরে সুলতানার সোনাঝরা মুখ, লাউ ডগার মতো বাঁকানো কোমর, ধানের ছড়ার মতো গুচ্ছ বিনুনী, বেগুনফুলের মতো ঢেকে থাকা চোখের মনি, কাওনের শীষের মতো চোয়ালের ক্ষুদ্র পশম, একটি একটি করে চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

www.pathagar.com

কানের কাছে একটা অদ্ভুত শব্দ বুঝতে পারে। সাত বছর আগে কুয়োতলার শিমুল গাছের নিচে, যে শব্দের মূর্ছনায় সে গ্রাম ছেড়ে এসেছিল। কে যেন মৃদুস্বরে বলছে, এক্ষুণি গ্রামে যা।

ঘুমের ভেতর চমকে ওঠে সলিম। না...। না... বলা চিৎকারে—শিমুল গাছ ছেড়ে কি যেন সড়সড় করে দ্রুত ছুটে পালালো।

নয়.

সূর্য ডোবার কিছু পরেই নদী পার হয়ে গ্রামে পা দেয় সলিম। বাড়ি পর্যন্ত আসতে আসতে অনেকটা রাত হয়ে আসে। পূর্ণিমার গুঁড়ো গুঁড়ো আলো নদীর ঢেউ-এর ফাঁকে রূপালী তলোয়ারের মতো তেলেসমাতি খেলা করে। বিষাদাসক্ত সলিমের মনটাও পূর্ণিমার এমন আলোয় সহসা কেমন চনমনিয়ে ওঠে। মনে পড়ে সাত বছর আগের সুলতানার কথা। নাগিনীর মতো দোলায়ীত খাঁজকাটা কোমরের কথা। হৃদয় নিংড়ানো উচ্ছাসের কথা।

এতো জ্যোৎসনার আলো, তবু কিছুই যেন চোখে ধরেনা সলিমের। তবে কী সে ভুল ঠিকানায় এসেছে?

কোথায় সলিমের সেই লেপা-পোছা মাটির ছোট্ট কুটির?

আরো একটু সামনে এসে দেখে শিমুলগাছ, আগের মতো তাজা নয়। গাছে পাতাও নেয়। দেখে মনে হচ্ছে-শুকিয়ে ঝনঝন করছে। আর ঠোটা দিলেই বুঝি বেজে উঠবে। সেখানে দুটো বড় বড় বিদেশী গাভী বাঁধা। খাবারের পর গাভী দুটো জ্যোৎস্নার আলোয় তৃপ্তির সাথে ঢেকুর তুলে আবার জাবর কাটছে। সহসা উত্তর পাশে তাকাতেই চমকে ওঠে! ইটের সাদা-বাড়ি। টিনের কার্ণিস সামনে ঝোলানো।

এখানে এমন বাড়ি কোত্থেকে এলো?

বাড়ি না হয় হলো, কিন্তু এতো হৈ-চৈ কেন এ বাড়িটাতে? তাছাড়া সলিমের বাড়িটায় বা কোথায় গেল?

সুলতানা কি তাহলে মায়ের বাড়ি চলে গেছে—সবকিছু ফেলে? নাকি আদৌও বেঁচে নেই।

দশ.

সামনের বাড়িটা থেকে খাবারের সু-ঘ্রাণ ছড়াচ্ছে। এমন খাবার দূরে থাক-ঘ্রাণটাও অনেকদিন নাকে আসেনি। ভেতর থেকে ক্ষুধার রাক্ষসটা যেন সহসা লাফিয়ে ওঠে। আর ক্ষুধা যখন গর্জন করে, কোনো কিছুরই তখন ভয় থাকে না। হ্যাচাকের দীপ্তিময় আলোর দিকে না তাকিয়ে সলিম হুড়মুড় করে সাদা বাড়িটায় ঢুকে পড়ে। বুঝতে পারে বাড়িটাতে কোনো অনুষ্ঠান হচ্ছে। খাবারের জন্যে ওকে ব্যাতিব্যস্ত হতে হয় না।

বঁধুর সাজে সজ্জিত কনে ঐ মুহূর্তে উত্তরের ঘর থেকে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। মনে হচ্ছে, ঘোমটার ফাঁক গলিয়ে কী যেন অনুসন্ধান করছে।

www.pathagar.com

মনে মনে সলিমের এই ভেবে ভয় হয় যে, তার মতো জেল-ফেরৎ আসামীকে বিয়ে বাড়িতে দেখে মেয়েটি, নিশ্চয় অশুভ ছায়া ভেবে বিরক্ত হচ্ছে। হয়তো এক্ষুণি ছুটে এসে জনমের মতো বিয়ে-বাড়িতে খাবার খাওয়ার সাধ মিটিয়ে দেবে।

খোঁচাখোঁচা দাড়ি সলিমের মুখে। এতো কিছুর পরেও হ্যাচাকের আলোয় সলিমের চেহারাটা জ্বলজ্বল করে ভেসে ওঠে।

বঁধুবেশী মেয়েটা ক্রমশ সলিমের দিকেই এগোচ্ছে। ভয় আর আতঙ্কে সলিমের ভেতরটা ধান-ভাঙা কলের মতো ওঠা-নামা করে। নিমন্ত্রণ ছাড়া বিয়ে বাড়িতে আসার ভয়ে সলিম দ্রুত পালাতে যায়। কিন্তু তামা-হাড়িতে উষ্টা লেগে ওখানেই পড়ে যায়। সবাই এসে ধরে ফেলে।

দ্রুত আসতে গিয়ে বিয়ের কনের বানারসি (আঁচল) ইষ্যৎ খসে পড়ে। নিরাভরণ মুখে সলিমের মুখের দিকে নাগাড়ে তাকিয়ে থাকে...।

সরাজের বাপ তুমি...?

সলিম চোখে হাত দিয়ে সহসা ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলে।

হ্যাঁ সুলতানা, হ্যাঁ...। হামি সরাজের বাপ। খাইব্যার আশায় এই বিহ্যার বাড়িতে আইস্যাছিনু। তাছাড়া কী কারো সংসারে হামি আসি?

সহসা সাঁ... করে একটা শব্দ শিমুল গাছের দিকে অদৃশ্যে ছুটে গেল।

শব্দের সঙ্গে কে যেন বলছে, 'আর একটু দেরি হলেই...

এগার.

আকাশ ভেঙে তখনও পূর্ণিমার চাঁদ ঐ শিমুল গাছের ফাঁক গলে আলো ছড়াচ্ছে। নাটোরের দীঘাপতি-রাজমহলের দেয়ালে বিছিয়ে থাকা হরিণের চামড়ার মতো, রাতের নিকশ আকাশে ছড়িয়ে আছে সাদায় আবছা মেঘের ছড়া। গোল চাঁদ ক্রমশ গুটি পায়ে পিলপিল করে সামনের দিকে এগোচ্ছে।

নীরব-সুলতানার চুম্বকীয় আবেশ যেন প্রবাহমান প্রতীক্ষায় দু'হাত বাড়িয়ে সামনের মানুষটার দিকে অনন্ত কাল ধরে তাকিয়ে আছে।

www.pathagar.com

জাহাজঘাটের দিলরুবা

একেবারে বস্তি না হলেও জায়গাটা বস্তির মতো। জাহাজঘাট। রাজশাহী শহরের প্রবেশ পথেই বিনোদপুর বাজার। বিনোদপুর বাজার থেকে আমজাদের গ্যারেজ-এর নিকট সামান্য বাঁক খেয়ে সোজা দক্ষিণে গিয়ে রাস্তাটা মিলেছে পদ্মায়। আর পদ্মার এ ঘাট-ই হচ্ছে জাহাজঘাট। শুকনো, মরা ধু-ধু পদ্মায় এখন তো আর জাহাজ চলে না—চলতো, অনেক আগে। বৃটিশ আমলে ভারত, পাকিস্তান থেকে আসা বাণিজ্য জাহাজগুলো এ ঘাটে এসে ভিড়তো—যা পাকিস্তান আমল পর্যন্তও বহাল ছিল। দেশ স্বাধীনের পর সেটা বন্ধ হয়ে যায়। তারপরও এখনও জায়গাটা স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে জাহাজঘাট নামেই পরিচিত। তবে এখন আর জাহাজ না ভিড়লেও বড় বড় বালিভর্তি স্যালোনৌকা জাহাজঘাটকে সচল রেখেছে। শহর থেকে ট্রাক এসে নির্মাণ কাজের পর্যাপ্ত বালি এখান থেকেই নিয়ে যায়।

এই জাহাজ ঘাটের সামান্য উত্তর পাশে শহর-রক্ষা বাঁধ চলে গেছে সোজা পূর্ব-পশ্চিম বরাবর। এই বাঁধকে কেন্দ্র করে দুপাশে গড়ে উঠেছে বেশকিছু ঘরবাড়ি। বিত্তহীন এবং নিম্নবিত্তর পরিমাণ-ই বেশী। তবে ইদানিং বালি দিয়ে মাজা কাঁসার থালা-বাসানের মতো জাহাজঘাটের রূপ ঠিকরে বেরুচ্ছে। বিকেল থেকেই গমগম করে নিত্যদিনের বাজার। এখন আর সব কিছুতেই যাওয়া লাগে না বিনোদপুর কিংবা সাহেব বাজার। পূর্ব পাশের পাকুড় গাছের নিচে বসে, নদীর টাটকা মাছের বাজার। বেশ কয়েকটি চা-পুরি-ঝুরি মিষ্টি-সিঙ্গারার বড় বড় হোটেল। এমনকি দুটি গিফট-এর দোকানও আছে। কেউ কেউ সাহস করে বাঁধের নিচে দালানও গেঁথেছে।

www.pathagar.com

বিকেল হলে বিশ্ববিদ্যালয় বিআইটির ছেলেরাও আসে ঘুরতে। কেউ কেউ স্রেফ হাওয়া খাওয়ার জন্য আসলেও অনেকেই আসে ডাইল খাওয়ার জন্য। তবে নদীর টাটকা মাছের জন্য বিকেল হলেই আশপাশের পাড়া-মহল্লা থেকে অনেকেই এসে ভীড় করে। এখানে যে যার ইচ্ছে মত ঘর-বাড়ি গড়ে তুলেছে। কেউ সনের কেউ মাটির আবার অনেকেই দু' নম্বর ইটের তৈরী ঘর বানিয়ে আয়েস করে বসবাস করছে। কেউ কেউ আবার দু' একটি ঘর ভাড়াও দিয়েছে। এমনি একটি বাড়িতে দিলরুবা বেগম স্বামী আবু নোমান ও ছেলে মেহেদীকে নিয়ে ভাড়া থাকেন। তবে এমন বাড়িতে প্রকৃতই দিলরুবা বেগমের থাকবার কথা নয়। বাবা-মা, শ্বশুর পক্ষের কারুর-ই সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই। স্বামী নোমানের একটি হাত কেটে ফেলা হয়েছে। নিজে একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে আছে। এ থেকেই পুরো সংসারটা চলে। স্বামী সচল থাকলে ওকে হয়তো বাইরের ঝামেলা এতোটা পোহাতে হতো না।

পনে আটটা বেজে গেছে। দিলরুবা কোন মতে নাকে-মুখে ঠুসিয়ে চায়ের কাপটা স্বামীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে যেতে যেতে বললো, আমি চললাম। আজও দেরি হয়ে গেল। মেহেদীর খাওয়া হলে স্কুলে পাঠিয়ে দিও। পারলে দু' পট চাল স্টভে তুলে দিয়ো। বাকিটা আমি এসে নিজেই করবো।

চা হাতে নিয়ে নোমান দিলরুবার গমন পথের দিকে একই ভাবে চেয়ে রইল। মনের মাঝে ভাবনার পাখিরা নিজের অজান্তেই পাখা মেলে ধরলো। বউটা এ সংসারের জন্য রাত-দিন কি অমানুষিক পরিশ্রম-ই না করে চলেছে। অথচ সে কতো বড় ঘরের মেয়ে। আজ কালকার দিনে কেউ এমন ভুল করে? ওরা তখন একসঙ্গে রাজনীতি করতো। শুধু মনের টানে। সঙ্গে নারী সুলভ জেদটাও ছিল প্রবল। বাবার সঙ্গে জেদ করে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং পাত্র ছেড়ে ওর মতো হতোদরিদ্রের সঙ্গে শহরের শেষ প্রান্তে বাঁধের উপর বসবাস করছে এই ঝুপড়ি ঘরে।

ক্যাম্পাস জীবনের সময়টা এখন ভাবলে মনে হয় ওর জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। সারাদেশে ছাত্রদের মাঝে আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ বয়ে যাচ্ছে। ওরা একটি আদর্শকে প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সামনে এগিয়ে চলেছে। সরকারী দলের ক্যাম্পাসে তেমন কোন অবস্থান নেই। কিন্তু দল ক্ষমতায় থাকায় খোলস থেকে বেরিয়ে এসে ধীরে ধীরে ওরা ক্যাম্পাসে নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। দিলরুবা ওর সঙ্গে একই দল করে। ওদের ভালবাসাটা ঘনিষ্ঠ হয়ছিল রাজনীতি থেকে। দিলরুবা ছিল মেয়েদের মধ্যে ক্যাম্পাস সভানেত্রী। বিভিন্ন কাজে তার সহযোগিতা দিলরুবার খুব প্রয়োজন ছিল। তবে ভালবাসার কথা দুজনেই তেমন একটা আড়ালে আবডালে বলার সুযোগ পায়নি। শুধু একজন আর একজনকে ফিল করতো। না দেখে কেউ কাউকে থাকতে পারতো না। দিলরুবা বলতো, ভালোবাসা মনের ব্যাপার, ঢাক-ঢোল পিটিয়ে রাস্তা ঘাটে বলে বেড়ার মত কিছু নয়। তবে এই ঢাক-ঢোল পেটার কাজটা ওদের বন্ধু-বান্ধবীরাই করে বেড়াতো।

www.pathagar.com

দিলরুবার জীবনে অনেক ঝড় বয়ে গেছে। তখন দল ক্ষমতার বাইরে। সরকারী দল এ সুযোগে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। দিনভর ক্যাম্পাসে মারামারী, মিছিল, বোমার আওয়াজ, ককটেলের শব্দ। গন্ডগোলের একটা পর্যায়ে ওরা বারো জন একটা হলে প্রতিপক্ষের রোষানলে আটকে পড়ে। সিনিয়র নেতা নোমান ভাই সবাইকে উঁচু দেয়াল পার করে দেয়। কিন্তু ভারি-মোটা শরীরের কারণে আটকে পড়ে নোমান ভাই। আধাঘন্টা পরে খবর পেলাম, নোমান ভাইকে ওরা কুপিয়ে হত্যা করেছে। আমি রহিম আরিফ ফরহাদ একসঙ্গে বসা। আশ্চর্য ভঙ্গিতে তাকালাম একে অপরের দিকে। কিন্তু একি! আমাদের নামেই উল্টা কেইস করেছে সরকারী দল। পুলিশ সবাইকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। হল তো বন্ধ হলোই, মেহেরচন্ড্রি-বিনোদপুর-চৌদ্দপাই-কাজলা-তালাইমারীর প্রতিটি ব্যক্তি-মালিকানাধীন মেসগুলোতেও গভীর রাত্রে পুলিশি হামলার স্বীকার হলো আমাদের দল এবং সাধারণ ছাত্ররা। নোমান ভাই-এর শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করে আন্দোলন চালিয়ে যাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু অ-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিটি মিছিল-সভায় বাধা দিতে লাগলো।

একদিন একসঙ্গে রাতের অন্ধকারে গ্রেফতার করলো সাতাশ জন। বে-আইনীভাবে পুলিশের রোলার চললো আমাদের পিঠে। সব চাইতে আমাকে এবং ফরহাদ ভাইকে ওরা বেশী মারলো। জেলের দিনগুলো সে কী করুণ এবং ভয়াবহ অবস্থা। প্রতিটি আঘাতের সঙ্গে প্রশ্ন। কেন আমরা সাধারণ দল ছেড়ে আদর্শিক সংগঠন করি? কেন আমরা মৃত্যুভয়ে ময়দান ছেড়ে চলে যায় না? এখন শাস্তি বোঝো?

ঈদের দিন। নিজ হাতে সেমাই রান্না করে জেলখানায় এসেছে দিলরুবা। গা-হাতের ব্যথায় নেংছে নেংছে স্বাক্ষাতরুমে এলাম। আমাকে শান্তনা দেবে কী নিজেই কেঁদে বুক ভাসাতে লাগলো দিলরুবা। ও এও জানালো, ওর বাবা বিয়ের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে।

হঠাৎ দরজা খোলার শব্দ হতেই স্মৃতি থেকে চোখ ফেরায় আবু নোমান। নদী থেকে গোসল সেরে কলতলায় দাঁড়ালো মেহেদী। ওর দিকে তাকিয়ে নোমান বললো, কতবার বলেছি নদীতে যাসনে, তবু কানে কথা যায় না বুঝি?

মেহেদী ভেজা প্যান্ট পাল্টাতে পাল্টাতে বাবাকে জবাব দেয়, নদীতে তো একবুকের বেশী পানি-ই নেই বাবা, ভয় করছো কেন?

হয়েছে, আর পাকামো করতে হবে না। ঘরে খিচুড়ি আছে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে ঠিক সময়ে স্কুলে যাও।

মেহদী এবার মাথা ঝাঁকিয়ে কেমন একটা মুখোভঙ্গি করে বাবার দিকে তাকিয়ে বললো, খাবো না। রোজ রোজ খিচুড়ি খেতে ভালো লাগে না। মা'কেই বেশি করে খেতে বলো।

www.pathagar.com

আবু নোমান ছেলের কথা শুনে কিছুটা অবাক হলো! তবু নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, কি করবো বল, ময়দা কেনা হয়নি তো। তাছাড়া তোর মা আর কত করবে।

ছেলেটা না খেয়েই স্কুলে চলে যায়। অকর্মন্য শরীর নিয়ে ছেলেকেই বা বলবে কী? তা ছাড়া দেখতে দেখতে চোখের সামনেই ছেলেটা বড় হয়ে গেল। সিক্সে পড়ে। ক দিন বাদে সেভেন এ উঠবে। তাছাড়া এমন উঠতি বয়সে অন্যান্য ছেলেরা হরলিক্স-মালটোভা-কমপ্লান কতো কী খায়। অথচ সে সিজিনাল দু'চারটে ফলমূলও ঠিক মতো খাওয়াতে পারে না। এতোক্ষণ খেয়াল-ই করেনি ওর অগচরেই কখন জানি দুফোঁটা পানি চোখ বেয়ে ওর হাতের কব্জির ওপর ঝরে পড়লো।

ওর একমাত্র সন্তান আজ না খেয়ে স্কুল গেল। আর ও অথর্ব বাবা হয়ে ঘরে বসে দিন পার করছে। অথচ ওর নানাবাড়িতে অঢেল সম্পদ বারো ভূতে ছিঁড়ে ছুঁটে খাচ্ছে। ওর চাচারাও হয়তো ভালোভাবেই দিনাতিপাত করছে। ওর নানা জিদ করেই কখনও মেয়ের খোঁজ-খবর নেয়নি। দিলরুবাও সহস্র অভাবে কখনও বাবার বাড়িতে পা দেয়নি। সবচাইতে বড় কারণ হচ্ছে দিলরুবার আত্মমর্যাদাবোধ।

মেহেদী স্কুলে যাবার পর স্টোভে চাল তুলে দিয়ে নোমান ঘরের জানালায় এসে বসলো। সামনে বিশাল পদ্মা মরা সাপের মতো শুকিয়ে খাঁ খাঁ করছে। ছেলেমেয়েরা বাম পাশ দিয়ে নৌকা ছাড়া হেঁটে হেঁটেই বিশাল পদ্মা পার হচ্ছে। একটি বারো তেরো বছরের ছেলেকে দেখে আবার মনে পড়লো মেহেদীর কথা। ও বাবা হয়ে ওর ছেলে আজ ওর সামনেই না খেয়ে দুপুর পর্যন্ত স্কুলে থাকবে? এর জন্যে ও নিজেই, ওর অথর্ব শরীরকেই দায়ী করলো।

আবার চোখের সামনে ভেসে উঠলো আন্দোলনের সেই রক্তঝরা দিনগুলো। রমজান মাস। রোজা থেকে প্রতি পক্ষের সঙ্গে মারামারি। মারামারি কেন যুদ্ধ বলাটাই সমীচীন। বেছে বেছে ওদের সংগঠনের ছেলেদের প্রভাবিত হলগুলোতেই আগুন দিয়েছে। ফায়ার সার্ভিস এসেছে আগুন নেভাতে। প্রতিপক্ষের সন্ত্রাসী ক্যাডার বাহিনী মেইন রাস্তায় ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি আটকে দেয়। একবার ভুল করে ও একাই শত্রু পক্ষের পাশের ঘরে নিজেদের সাথী-ভাইদের রুম ভেবে ঢুকে পড়ে। বিপদ বুঝতে পেরে পালাতে গিয়ে পেছন থেকে একটা হাতবোমা ওর কব্জির উপর পড়ে খসে পড়ল বাম পায়ের বুড়ো আঙুলের ওপর। সে কি যন্ত্রণা! এর চেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভালো । প্রথমবার জেলখানায় যাওয়ার পর বাবা মকবুল হক হুসিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছিল, ওসব আদর্শ টাদর্শ বুঝিনা। এরপরও যদি ওসবে জড়িত থাকিস, তবে বাড়ি থেকে সব রকম খরচ বন্ধ। প্রয়োজনে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক ছিন্ন করতে আমার একটুও বুক কাঁপবে না। কারণ পিতার বিপরীত আদর্শ যে সন্তান লালন করে, সে সন্তান আমার প্রয়োজন নেই। সেই যে বোমার আঘাত। কব্জি থেকে ডান হাত কেটে ফেলতে হলো আর বাম পায়ে হাঁটা যায় কিন্তু ঠিকমত শক্তি পাওয়া যায় না। পরপর দুবার জেলখানায় যাবার পর

www.pathagar.com

বাড়ির সঙ্গে সব রকম যোগাযোগ ও সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। মেহেদীর দাদার বাড়িতে আজ কত আম। অথচ এক কেজির বেশী ছেলেটিকে কিনে দেয়ার সামর্থ নেই ওদের। জেলখানা থেকে ফিরে আসার পর দিলরুবার ইচ্ছায় এবং ওর বান্ধবীদের সহযোগীতায় নুরুননবী স্যারের বাসায় সেই মুহূর্তের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওদের বিয়ে হয়। সেই থেকে দিলরুবা তিনতলা থেকে নেমে এসে ওর সঙ্গে এই সাধারণ ঘরে বসবাস।

দিলরুবা ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রী হওয়ায় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে চাকরিটা ন্যায় সঙ্গতভাবে হয়ে যায়। ওর বোমার আঘাতে ক্ষত হাত সারিয়ে তুলতে স্কুল থেকে অনেক টাকা লোন করতে হয়েছে। কিন্তু তবু দিলরুবা বাবা-মা এমনকি ডাক্তার বোনের কাছেও হাত পাতেনি। ওর বোন করুণা করে হলেও একবার সহযোগীতা করতে এসেছিল, দিলরুবা ফিরিয়ে দিয়েছে। নোমান পর মুহূর্তে ঠাট্টা করে বলেছিল এই বিপদের মুহূর্তে ওকে ফিরিয়ে দেয়া কি ঠিক হলো?

দিলরুবা ফুঁসে উঠে বলেছিল, যে আদর্শের জন্য আজ আমরা বাবা-মা সবকিছু ত্যাগ করে বস্তির মত জায়গায় বাস করছি—এতো তাড়াতাড়ি সব ভুলে গেলে? পরপর দুদিন ওর সঙ্গে কথা বলেনি দিলরুবা। সেদিন নোমান আরও একবার দিলরুবার জেদী-রূপটা চিনতে পারলো। আর জেদ হবেই বা না কেন? সৎ আদর্শের কারণে নিজেদের রক্ত যদি সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে তাহলে, ও কেন পারবে না? এছাড়া ওর স্বশিক্ষিত জীবনে আর আছেই বা কী? ছাত্রজীবন থেকে অদ্যবধি দুজনের নিষ্কলুস ভালবাসা, আর প্রবাহিত রক্তের সঙ্গে জিদ- এ দুটোই তো ওর একমাত্র সম্বল।

পাশের ঈদগাহ মসজিদ থেকে সবেমাত্র জোহরের আজান শেষ হলো। খিরকী দরজার ঝাপ খোলার শব্দে স্বচিকিত হয় নোমান। ও সোহাগী। আমি তো ভাবছিলাম তোর ভাবী বোধ হয় স্কুল থেকে ফিরেছে?

সোহাগী ভ্রু নাচিয়ে বলে, আমাদের তো চোখে লাগবে না। সারাক্ষণ শুধু ভাবীকেই চোখে পড়ে। আমার বয়স কি ভাবীর চেয়ে কম, না বেশী?

আরে তোর ভাবীর মাঝে কি মধু আছে তা তুই কী বুঝবি? তবে তোর কোমরের খাঁজ আর অপুর মতো সুন্দর চেহারাটা দেখতে ভালোই লাগে।

থাক আর আমাকে নিয়ে বাঙ্গি ফাটাতে হবে না। তোমার ঐ সুন্দরী একরোখা বউটা এলো বলে।

এই আমার বউকে হিংসে, তাহলে আসিস কেন এ বাড়িতে?

আসি কেন মশায়। না এলে তোমার ভাতের পাতিল কে নামিয়ে দিতো চুলো থেকে?

কিছুক্ষণ থেমে সোহাগী আবার বলে, আচ্ছা ভাই, ভাবীর মতো এমন সুন্দরী মেয়ে রাণীর মতন চেহারা, বাপের নাকি তিনতলা বাড়ি আছে। সে তোমাক কেমন কৈরি বি করলো? তোমার তো বাড়ির বাহির যাওয়ায় বিপদ। তাও আবার ভালো বাইসি বি।

www.pathagar.com

শোন, তুই যেমন আমাকে ভালো বাসিস—তাই এ বাড়িতে সারাক্ষণ আসিস, তেমনি তোর ভাবিও আমাকে অমন করে ভালবেসে বিয়ে করেছে। এখন যা, তোর ভাবি এলো বলে।

কাম নাইতো তোমাক ভালবাসতে আমার বয়েই গেছ।

মুখে ভেঙচি কেটে জিব উল্টে খুলে যাওয়া খোপাটি বাঁধতে বাঁধতে বেরিয়ে গেল সোহাগী। ও ভাবীকে ভীষণ ভয় পায়। পাশের বাড়ির মেয়ে। স্বামীর স্বভাব ভালো না। ফেন্সি, ভাঙ সব খায়। বনিবনা না হওয়ায় সাত মাস ধরে মায়ের বাড়িতে আছে। তবে কথা চটাং চটাং বললেও মেয়েটার দিল ভালো। ও বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মা-ছেলে এক সঙ্গে বাড়িতে ঢুকলো। ঢুকেই দিলরুবার মাথা গরম। ব্যাগটা নিচে রেখেই নোমানকে প্রশ্ন, সোহাগী কেন এসেছিল? তোমার সঙ্গে ওর কিসের এতো খাতির? আমি না থাকলে ও কেন আসে?

নোমান অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করে। দেখ, তেমন কিছুই না। প্রতিবেশী সুলভ আচরণে ও এমনিতেই আসে। তাছাড়া যে লোকটা অথর্ব পঙ্গুই বলা চলে, যার ছেলে পুরো দমে সিক্সে পড়ে, তার মতো লোককে এমন সতের বছরের যুবতী কোনো দিন ভালোবাসতে পারে?

এবার দিলরুবা কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, হোক পঙ্গু অথর্ব তবু আমার জিনিস, অন্যের জিনিসে ও কেন চোখ লাগাবে? ওর চোখ আমি কানা করে দেব। এবার এলে ওর পা ভেঙে লুলা করে দেব হ্যাঁ?

নোমান ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়। ধীরে ধীরে শান্ত হয় দিলরুবা। এবার নোমানের বুকে মাথা গুঁজে বুকের পশমে হাত রেখে বলে, খবরদার, ওর সাথে কক্‌খনও তুমি কথা বলবে না। আর ছয়টা মাস অপেক্ষা করো, আমার স্কুলের বেতনটা সম্ভবত বাড়বে। তখন আর আমরা এখানে থাকব না। কিছুটা হলেও এর চেয়ে ভাল বাড়িতে উঠবো।

ভেতর ভেতর নোমানের চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে আসতে চাইলো। মনে মনে ভাবলো ও অনেক বড় ঘরের মেয়ে। যার বাবার তিনটে শুধু আমের বাগান-ই আছে। অথচ সংসারের জন্যে সেই ভালোবাসার জন্যে আজও কি পরিশ্রমটাই না করছে। কিন্তু উপায় নেই। ও নিজেও যেহেতু কিছু করতে পারে না, কাজেই ওর এমন পরিশ্রম ইচ্ছে না থাকলেও মেনে নিতে হচ্ছে। ওদিকে ছেলেটা বড় হচ্ছে, ওর পড়াশোনার খরচও বাড়ছে। এর আগে ও একবার নয় কয়েকবার দিলরুবাকে বলেছিল, এভাবে বসে না থেকে কিছু একটা করলে হয় না? নিদেন পক্ষে ছোট একটা দোকান নিয়েও তো বসা যায়। দিলরুবা তাতেও রাজি হয়নি। প্রথমে ভূত দেখার মতো চমকে উঠেছিল। তুমি দোকান করবে? এই শরীরে? পরে বিনয়ের সঙ্গে বলেছিল, না গো, তোমায় কিছুই

www.pathagar.com

করতে হবে না। আমাদের কী দিন চলছে না। আল্লার উপর ভরসা রেখ, সব ঠিক হয়ে যাবে।

নোমান শুধু, 'কিন্তু' বলায় দিলরুবা বলেছিল, কোনো কিন্তু নয়। তাছাড়া তুমি এম এ পাশ করেছো। আমি চাই না তোমায় ফুটপাতে দেখে আমার বাবা-মা হেয়ো প্রতিপন্ন করুক। জীবিকার জন্যে চাকুরী একজনকে করতেই হবে, সে কাজটা না হয় আমিই করছি। সেই থেকে আর দিলরুবাকে কিছুই বলেনি।

ক'দিন ধরে মেহেদীর ভীষণ জ্বর। বেতন হতে দেরী আছে এখনও পনের দিন। দিলরুবা ওর এক বান্ধবীর কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে ওষুধপত্র এনেছে। জ্বরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পেটটাও খুব ব্যথা করছে। সরিষার তেল দিয়ে পেট টা ডলে দিতে দিতে দিলরুবা নোমানের দিকে মুখ তুলে বললো, মেহেদীর পেটে বড় রকমের কিছু হলো নাকি। তুমি বললে ওকে ডাঃ শফিউর রহমানের কাছে নিয়ে যায়।

নোমান বোঝে না তা নয়। কিন্তু বড় ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলে নানান ধরনের টেস্ট দেবে। অনেক টাকার ব্যাপার। কোন মতে নোমান অনিচ্ছা সত্ত্বেও বললো, এবারের মতো দেখো সারে কি না। ভালো না হলে তো নিয়ে যেতেই হবে।

এমন সময় বাহির দরজার ওপাশ থেকে মেহেদী বলে কে যেন ডাকছে। দরজা খোলায় ছিল। বাঁধে নদীর মাছ বিক্রি করে রহমান মোল্লার ছেলে বকুল। দিলরুবা ঘর থেকে বের হয়ে আঙিনায় মুখ তুলে। বলে, মেহেদীর খুব জ্বর কিছু বলবে? মেহেদীর মতোই বয়স বকুলের। দরজার দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে বলে, আপনাদের মেহমান বাহিরে দাঁড়িয়ে আছে।

দিলরুবা বললো, আমাদের মেহমান তো বাইরে কেনো ভেতরে আসতে বল। দরজা খুলে বাইরে বেরুতেই দিলরুবা অবাক! কদমতলায় দাঁড়িয়ে আছে একটি চকচকে পাজেরো গাড়ি। ওর দিকে তাকিয়ে আছে প্যান্ট-টাই পরা এটাচি হাতে এক ভদ্রলোক। দিলরুবা আঁচলটা সামনের দিকে টেনে অপ্রস্তুত অবস্থায় কিছু বলতে যাচ্ছিল। এমন সময় ভদ্রলোক নিজেই মিষ্টি করে হেসে বললো, আমি নোমানের বড়মামা। ওকি বাড়িতে আছে?

এবার ঘোমটা টা আরও খানিকটা বাড়িয়ে দিল দিলরুবা। ভেতরে আসুন—বলে পেছন ফিরে এক দৌড়ে নোমানের সামনে এসে দাঁড়ালো। কাছাকাচি এসে আস্তে করে বলে, বড়মামা এসেছে। নোমান কিছুটা নড়ে চড়ে বসলো। অস্ফুটে মুখ থেকে বেরোলো, বড়মামা এসেছে?

ঘরে একটি মাত্র কাঠের পুরোনো চেয়ার। সেটাই ঝেড়ে মুছে বসতে দিল মামাকে। মামা মুর্শেদ সাহেব দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে রইল ভাগ্নের দিকে। নিজের কাছে নিজেই প্রশ্ন করলো, এক সময়ের তুখোড় ছাত্রনেতার আজ, একি অবস্থা! মামাকে দেখে নোমানের কপালেও ভাঁজ পড়লো। মামা এক সময় কিছুই করতো না। তবে একেবারে কিছু

www.pathagar.com

করতো না বললে ভুল হবে। রাজনীতি করতো। তাও আবার যে দল যখন পজিশনে মামাও সে দলের সদস্য তখন। সেই মামা আজ এতো বছর পর সঙ্গে পাজেরো। দিলরুবা ব্যস্ত হয়ে বাইরে গেল কিছু আনার জন্যে। নোমান ঢোক গিলে মামার গলার টাই টার দিকে তাকিয়ে বললো, মামা সব খবর টবর ভালো তো।

মামা সিগারেটের ছাইটা ফেলে বললো, খবর এমনিতে সব ভালো, তবে তোদের বাড়ির খবর ভালো না। নোমান উদগ্রীব হয়ে বলে উঠে, কেন কি হয়েছে?

তোমার আব্বার প্রেসার এবং হার্টের অসুখটা মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে গেছে। মনে হয় বাঁচবে না। তাই বলছিলাম কি, বউমাকে নিয়ে নবাবগঞ্জ চলে যা। নদীর ধারের এলাকা। আবহাওয়াও বেশ ভালো। ওখানে ভালো থাকবি।

এমন সময় দিলরুবা প্লেটে কিছু নিয়ে পেছনে এসে দাঁড়ালো, মুর্শেদ সাহেব বললেন, কি দরকার ছিল বাউমা তোমার ব্যস্ত হওয়ার?

তেমন কিছু না সামান্য মুখে দিন।

মুর্শেদ সাহেব মাত্র একটা মিষ্টি মুখে দিলেন। আর অন্যান্য সব সিঙ্গারা পেঁয়াজী প্লেটেই পড়ে থাকলো। ঠিক যেন নিয়মটা রক্ষা করলো। এক ঢোক পানি খেয়ে গ্লাসটা রাখলো টেবিলে। মুখটা এমন ভঙ্গি করলো যেন গ্লাসটায় কোন এঁটো ভরে আছে। বাহারী রুমাল দিয়ে হাত মুছতে মুছতে বললো, বউমা, শুনেছি তোমার বাবা নাকি খুব ধনীলোক; তারপরও তোমরা এমন পরিবেশে থাকো?

মামা আপনার ভাগ্নেও উঁচু ঘরের সন্তান। কিন্তু আমরা যে অবস্থার মধ্যে আছি আমার শ্বশুর কি কোন দিন খবর নিয়েছেন।

যে সন্তান পিতার বিপরীত আদর্শের রাজনীতি করে তাকে সেই বাপ কিভাবে দেখবে?

আপনাদের ভাগ্নে তো কোন অন্যায় বা খারাপ কিছু করেনি?

তা বুঝলাম, কিন্তু এসব করে ও কি পেল বল? বিনিময়ে পঙ্গু হয়ে ঘরে বসে প্রহর গুনছে।

'পঙ্গু' কথাটা শুনে দিলরুবার ভেতর জ্বলে পুড়ে খাক হয় যাচ্ছিল। কিন্তু সম্মানে বড়, মামাশ্বশুর, এছাড়া ওর বাড়িতে এসেছে আজ প্রথম, তাই দিলরুবা রাগকে অনেক কষ্টে সংবরণ করে বললো, দেখুন মামা নোঙরা অসৎ রাজনীতি করে অনেকেই গাড়ি-বাড়ি বানিয়েছে। আমরা কিছু না পেলেও লুটপাট আর দুর্নীতির কাছে সমর্পন করে নিজের আদর্শকে বিক্রি করে দেয়নি। অন্তত এটুকু জেনে সুখে আছি যে, আমাদের সন্তানকে আমরা অবৈধ টাকায় গড়ে তুলছি না। আর আমরা যে রাজনীতি করেছি, তা সততার পথে অবিচল।

কিন্তু বউমা এই সততার কোন মূল্য আছে এ দুনিয়ায়?

www.pathagar.com

ঠিক-ই বলেছেন মামা, এ দুনিয়ায় এর কোনো মূল্য নেই। তবে পরকাল বলে যদি কিছু থেকে থাকে, সেখানে আজকের এই দলত্যাগদের গাড়ি-বাড়ির কোন মূল্য নেই। সেখানে শেষ দিবসের মালিকের সামনে বিচার্যের একমাত্র মাপকাঠি হচ্ছে—সততা।

মুর্শেদ সাহেব—দলত্যাগী, গাড়ি-বাড়ি কথাটা শুনে সামান্য ঝাঁকি খেলেন। মনে মনে ভাবলেন, বউমা কি তাকেই ইঙ্গিত করে কথাগুলো বললো। নাহ, এমন শিক্ষিত রাজনীতি করা মেয়ের সঙ্গে কথায় পেরে উঠা মুশকিল। এবার খুব শান্ত ভাবে বলে, বউমা তুমি যাই বলনা কেন, এটা তোমাদের একটা অদৃশ্য আকর্ষণ। যেদিন মোহ ভঙ্গ হবে সেদিন বুঝবে। তবে তোমার বাবার অঢেল সম্পদ, শ্বশুরের সবকিছু পায়ে ঠেলে যেভাবে তুমি সংসারকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছো তাতে এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ তুমি ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। যদিও সংসারের অবস্থা খুবই করুন।

দিলরুবার মনে এর উত্তর তৈরী-ই ছিল কিন্তু প্রথম দিনেই মামাশ্বশুর রুষ্ট না হন এটা ভেবেই আর কিছু বললো না। যাবার সময় মুর্শেদ সাহেব বারান্দা থেকে আঙিনায় নেমে দিলরুবাকে ডাকলো। দিলরুবা কাছে যেতেই একটি কাগজ মানিব্যাগ থেকে বার করে বললো,বউমা আজ আমার অন্তত একটি কথা শোন—এটা রাখো।

দিলরুবা দেকলো একটি দশহাজার টাকার চেক। ঘোমটা টা একটু বড় করে টেনে দিয়ে বললো, মামা, আমি কোন বংশের মেয়ে আর কোন আদর্শে গড়া আশাকরি ইতিমধ্যেই আপনি জেনে গেছেন। আমার স্বামীর করুণা পর্যন্ত আমি নেইনি। এই শরীরে ও কিছু একটা করতে চেয়েছিল। আমার বোন বড় ডাক্তার। একটা পুরো ফ্লাট আমাকে দিয়ে দিতে চেয়েছিল—আমি নেইনি। আশা করি কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছেন। তবে হ্যাঁ আমার শ্বশুর অসুস্থ, আপনাদের ছেলে আমি অবশ্যই যাবো।

সিগারেটের শেষ অংশ জোরে পা দিয়ে পিষে দ্রুত হন হন করে বেরিয়ে যান মুর্শেদ সাহেব। মেহেদীর জ্বর এখন অনেকটাই ভালো। নদীর ধারে বন্ধুদের সঙ্গে বসে গল্প করছে। নাঈম বলে, কিগো তোমরা এতো বড়লোক আগে তো কখনও বলনি। বিপ্লব বলে, ও বুঝেছি, এতোদিন ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিলি না?

মেহেদী বলে এতে জল খাবার কি আছে?

তোমার আব্বার মামা এতো বড় গাড়ি নিয়ে এসেছে। তোমার দাদারাও নিশ্চয় অনেক বড়লোক। যদিও বা মেহেদীর মনের কথা নয়—তবু বন্ধুদের কাবু করার জন্যে বললো, তাহলে তোরাই বুঝ, আমরা কতো বড়লোক অথচ তোরা প্রথম প্রথম আমাদের পাত্তাই দিসনি।

পাড়ার মহিলারাও জানলো, মাষ্টারনি উঁচু বংশের ধনি পরিবারের বউ। এমনিতেই দিলরুবাকে সবাই সমীহ করে চলতো—এম এ পাশ মাষ্টারনি বলে। এখন ওরা ওকে

www.pathagar.com

আরও সম্মান করতে লাগলো। কারণ দিলরুবা কখনও নিজেদের কথা আদিখ্যেতা দেখিয়ে বলে বেড়ায়নি।

পাড়ার লোকেদের সবার কম বেশী প্রশ্ন—একটা বস্তির মতো এলাকায় কেন এই শিক্ষিত পরিবারটি পড়ে আছে। তবে দিলরুবা কিছুই মনে করে না। পাড়ার লোক যা খুশি বলুক। ওর খেয়াল করার সময় নেই। এ ধরনের মুহূর্তে ও কামিনী রায়-এর ঐ 'পাছে লোক কিছু বলে' কবিতাটি বারবার খুব স্মরণ করে।

রাতে শ্বশুরবাড়ি যাবার বিষয়ে কথা তুললো দিলরুবা। কিন্তু আবু নোমান যেতে রাজি নয়। যখন সুস্থ ছিলাম তখন যেতে পারিনি এখন গেলে ওরা নিশ্চয় ভাববে, কোন উপায় সম্বল নেই, তাই সংবাদ পেয়েই ছুটে এসেছে।

দিলরুবা বললো, এটা আবার কেমন কথা? বাবা মৃত্যু শয্যায়, তুমি সন্তান—যাবে না কেনো? তোমার ওসব কথার কোনো ভিত্তি আছে? অবশ্যই তুমি যাবে।

আহ, দিলরুবা তুমি বুঝতে পারছো না। এরকম শারীরিক অবস্থা নিয়ে কোন মুখে আমি ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াবো।

শোনো, এতো বড় ছেলে নিয়ে নতুন বউ সেজে শ্বশুর বাড়ি যাওয়া আমারও লজ্জা করে কিন্তু তাই বলে অসুস্থ মানুষকে দেখতে যাব না?

কিন্তু আমার মন বলছে এটাও একটা চাল। বাবার অসুখ নাও হতে পারে।

কিন্তু আমার মন বলছে, এমন একটা খবর শুনে না যাওয়াটা ঠিক হবে না। কালই চলো।

তোমার স্কুল।

সে আমি দেখবো। কিন্তু আমার অনুরোধ তুমি রাজি হও।

নোমার মনে মনে ভাবে, এখন যাওয়ার জন্য লাফাচ্ছে। আবার যখন দু একটা খোঁচামারা কথা ওখানে গিয়ে শুনবে, তখন আবার আসার জন্যে অস্থির হয়ে চোখের জল ফেলবে—এ হচ্ছে মেয়েদের অভ্যাস।

দুপুর একটা নাগাদ চাঁপাইনবাবগঞ্জ গিয়া পৌঁছলো ওরা। বাস থেকে নামাতে নোমানকে সাহায্য করলো হেলপার। সুটকেশ মেহেদীর হাতে আর দিলরুবা নোমানকে ধরে একটা রিক্সায় উঠালো। রিক্সায় উঠে নোমান স্বগতোক্তি করে বললো, এ জন্যেই আমি যার্নি করতে চাই না। পা টায় কেমন কনকনে ব্যথ্যা—মনে হচ্ছে কেটে ফেলতে পারলে ভালো হতো।

বাস থেকে নামার সময় হেলপারের তাড়াহুড়ায় বাম পাটায় চোট পায়। দিলরুবা অবশ্য হেলপারকে ধমক লাগিয়ে ছিল। কিন্তু গাড়ির লোকেরা এমন-ই, ধমকে লাভ নেই। চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনী। দিলরুবারও খুব খারাপ লাগছে—ব্যথাটা জেগে উঠার জন্যে।

www.pathagar.com

রিক্সা থেকে নেমে বাড়ির দরজার কড়া নক করতেই প্রথমে শাশুড়ি, তারপর ভাঙামাজা নিয়ে দাদিশাশুড়ি দরজায় এসে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকলো দিলরুবার মুখের দিকে! দাদিশাশুড়ি আকলিমা বেওয়া দরজা থেকে আবার ভেতরে ফিরে যেতে যেতে বললো, এই বুড়ি বেঁচে থাকালীন নতুনবউ সহজে যেতে পারবে না।

ইতিমধ্যে পাড়ার বেশ কিছু বউ-ঝি, রাও এসে ভীড় জমিয়েছে। দিলরুবা ভাবলো, এমন ব্যারিকেড তো আশা ছিল না। আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে দরজার সামনে? এই বুড়িটা কি সত্যিই পাজি? আবু নোমানের মা নাতিকে কাছে ডেকে নিয়ে অবাক বিস্ময়ে শুধু তাকিয়ে আছে—বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া, রাজনীতি করা, রূপের মোহে ওর ছেলেকে আটকে রাখা, এক সন্তানের জননী-দিলরুবার দিকে। পাশাপাশি দিলরুবার চেহারায় একটা ব্যক্তিত্বের ছাপ দেখতে পেল, যা দেখলে যে কোনো মানুষ আপন মনেই সমীহ করবে। কিন্তু দিলরুবার ধারণা মিথ্যায় পরিণত করে, দাদিশাশুড়ী এক হাতে বনেদি কাঁসার গ্লাসে শরবত আর অন্য হাতে মিষ্টি, আরও সব কি কি নিয়ে দিলরুবার সামনে এগিয়ে এলো। নতুনবউ ঘরে তোলার যা যা আঞ্চলিক রেওয়াজ আছে তা পুরোপুরি সম্পন্ন করেই দিলরুবাকে ঘরে তোলা হল। দিলরুবা তো লজ্জায় চোখ-মুখ লাল হয়ে মরে যাচ্ছিল। সত্যিই এই এগার বছরের ছেলে সঙ্গে করে নতুনবউ এর ভূমিকায় আপ্যায়ন লজ্জায় লাল কেন, নীল হয়ে যাওয়ার-ই কথা। কিন্তু উপায় নেই—মাজাভাঙা বুড়ি ভীষণ কড়া, মানতেই হবে।

তবে মনে মনে একটা সুখ সুখ অনুভূতি মানে নির্মল প্রশান্তি অনুভব করছিল দিলরুবা। আর হবেই বা না কেন? বিবাহিত জীবনে এই প্রথম কোন নিকট আত্মীয়ের—এমন আপ্যায়ন ওর ভাগ্যে জুটলো।

নোমান ঘরে গিয়ে দেখলো, ওর বাবা একদিকে কাত হয়ে মরার মতো পড়ে আছে। শুধু অসুখ নয় বলা চলে মৃত্যুপথযাত্রী। ডায়াবেটিস-জনডিস-হার্ট সব এক সঙ্গে। নোমানের আম্মা এসে পাশে বসলো। রাশভারী গোছের মানুষ। ছেলে-বউ আসার পর এই প্রথম কথা বললেন। তাও আবার নোমানকে ইঙ্গিত করে। পথ্য খাওয়ানোই বিপদ হয়েছে। জন্ডিসের জন্য আখের রস বা এ জাতীয় খাবার দিলে ডায়াবেটিস যা দ্রুত বেড়ে যায়। আবার ডায়াবেটিসটা মানলে জন্ডিস বেড়ে যায়। হৃদপিন্ড ভীষণ দুর্বল। ডাক্তার বলেছেন, ভরসা নেই বললেই চলে। মনের জোরটুকু ছাড়া আর কিছু করার নেই। নোমান এবার উঠে বাবার শিউরে বসলো। ওর বাবা সামান্য নড়াচড়া করে প্রসারিত করলো মাংসল ঠোঁটদুটো। কিন্তু কোন কথা বলতে পারলো না। দিলরুবা এসে আলতো করে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে শ্বশুরের মাথায়।

পাঁচ দিন হতে চললো ওদের এ বাড়িতে আসা। প্রয়োজনীয় কথার বাইরে কেউ কোন কথা বলছে না নোমান কিংবা দিলরুবার সঙ্গে। ভাবখানা এমন, আরো আগে যদি নতুনবউ আসতো শ্বশুর মশাই সব রাগ ভুলে ঘরে তুলে নিতেন। এখন আসা না আসা

www.pathagar.com

সমান কথা। দিলরুবা শ্বশুরবাড়িতে এসে ইতিমধ্যেই জেনে গেছে ভাসুর- দেবর কেউ আর এ বাড়িতে নেই। সবাই যার যার ইচ্ছে মতো সেটেল্ড। বাবার ব্যবসা বাগান ভাইয়েরা নিজেরই ভাগ-বাটওয়ারা করে আলাদা আলাদা জীবন-যাপন করছে। কেউ এলে বাবাকে খুব জোর চোখের দেখাটা দেখে নিজ নিজ বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। বাড়িতে যে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে—প্রতিটি বিষয়ে স্পষ্ট। এতো বড় বাড়ি ছয়খানা ঘর তবু বাজার করার মতো মানুষ নেই বললেই চলে।

ওদের আসার ঠিক সাত দিনের মাথায় মারা গেল নোমানের বাবা। কাফন-দাফনের পর নিকট আত্মীয়রা কেউ একদিন কেউ দুদিন থাকার পর নিজ নিজ বাড়ি ফিরে গেল। দিলরুবার দাদীশ্বাশুড়ি ওর সামনে এসে বললো, যে কটা টাকা জমা ছিল সবই প্রায় শেষের পথে। দুই বিধবার এখন কী হবে? নাতবউ তোমরাও কি চলে যাবে?

যেতে তো হবেই দাদী তাছাড়া আমার ছুটিও তো শেষ।

আমাদের তাহলে কী হবে বউ। সবাই নিজ নিজ ধান্দায় কেটে পড়েছে। শুধু এই ভিটে টুকু তুলে নিয়ে যেতে পারেনি বলে পড়ে আছে।

এক কাজ করুণ না হয় দাদীমা। সামনের তিনটে ঘর ভাড়া দিয়ে দিন। কম করে হলেও দু-হাজার টাকা বাড়তি পাওয়া যাবে।

কিন্তু নাতবউ তোমার শাশুড়ি কি তা মানবে? খানদানী বংশের নিয়ম-কানুন-ই আলাদা।

খানদানী আর থাকলো কোথায় দাদীমা। এ বাড়ির ছেলেরা যদি লুটেরার মতো অসুস্থ বাবার সব কিছু নিয়ে যায়। আর সেই বাড়ির যদি করুণ পরিণতি স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়—তখন এছাড়া আর উপায় কী?

রাতে দিলরুবা নোমানকে জানালো, ওর ছুটি শেষ। এখন রাজশাহী যাওয়া দরকার। নোমান শুনে চুপচাপ থাকলো। হ্যাঁ কিংবা না কোনটাই তার পক্ষে বলা সম্ভব হলো না। একদিকে মরার বাড়ি তার উপর দীর্ঘদিনের জমে থাকা কাজ। কাজ করতে করতে দিলরুবা খুব কাহিল হয়ে পড়ে ছিল। তাই খুব সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়েছিল আজ। হঠাৎ ঘুম ভেঙে খেয়াল করে ওর বুকের কাছে ও নাকে মুখে জমে উঠেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। পানির তৃষ্ণাটা তীব্রভাবে অনুভব করে। হাতের কাছেও জগ-গ্লাস কিছু দেখতে পেল না। ধীরে ধীরে বারান্দায় বেরিয়ে আসে। হঠাৎ খেয়াল করে কারা যেন কথা বলছে। বেশ কিছুক্ষণ কান খাড়া করে বুঝতে পারে উত্তরের ঘরে অর্থাৎ শাশুড়ির ঘর থেকে শব্দটা আসছে। কৌতুহল ওকে টেনে নিয়ে যায় দরজার কাছে। আড়িপাতার মতো সব কথা ওর কানে আসে।

তিনজন মানুষ কথা বলছে। আবু নোমান ওর শাশুড়ি এবং দাদীশাশুড়ি। ভাসাভাসা যেটুকু কানে এলো তার অর্থ হচ্ছে, বাবার সম্পদ সব ভাইয়েরা নিয়ে গেছে। এখন যদি নোমান বাড়ি ছেড়ে চলে যায়, অন্য ভাইয়েরা বাড়ির ভাগ নিতে মরিয়া হয়ে ছুটে

www.pathagar.com

আসবে। অতএব, নোমানের এ বাড়ি ছেড়ে গেলে চলবে না। অসুস্থ হলেও একজন পুরুষ মানুষতো থাকা দরকার। মেহেদীকে পাশের স্কুলে ভর্তি করে দিলেই চলবে। আর বউমা যদি চায় এখানেই ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর কলেজ হয়েছে। বলে কয়ে একটা ব্যবস্তা করা যাবে।

অবশ্য নোমান মা'কে বললো, দিলরুবার সঙ্গে একটু এ বিষয়ে আলাপ করে নিলে ভালো হতো না?

বউমা আবার কী বলবে? তুই যা বলবি তাই। তোর যদি এই দুরদিনে আমাদের পাশে থাকতে মন না চাই, তাহলে তুইও কাল চলে যাস। ভাববো ছোটবেলা দুধকলা দিয়ে গুচ্ছেক সাপ পুষে ছিলাম।

দিলরুবা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। সারারাত কেঁদেছে আর চোখ মুছেছে। সকালে উঠে প্রাত্যকালীন সব কাজ ঠিক মতই করেছে, তবে নোমানের সঙ্গে একটি কথাও বললো না। মেহেদী কী কিনে নিবে তাই মায়ের কাছে বায়না ধরেছে। দিলরুবা টাকা তো দিলোই না ছেলের জেদ দেখে কষে একটা চড় মারলো। মেহেদী কাঁদতে কাঁদতে বাবার কাছে গিয়ে নালিশ জানালো। তবে দিলরুবা একটা বিষয় খেয়াল করেছে, নিজের বাড়িতে আসার পর নোমান যেন অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে। সম্ভবত রাজশাহীতে ঘরে বসে থেকে ও আরও বেশী দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া নিজের বাড়ি নিজের এলাকা, আত্মবিশ্বাসটাই বুঝি ওকে অনেকটায় সুস্থ করে তুলেছে।

রাতে দিলরুবার ঘরে শুতে এলো নোমান। বললো, কি ব্যাপার তুমি আজ সারাদিন কথা বলনি আমার সঙ্গে।

ভালো লাগেনি তাই।

আচ্ছা কি হয়েছে বলবে তো।

কি আবার হবে। রাজশাহীতে বস্তির মত ঘরে আমার স্বার্থে তোমাকে বন্দি করে রেখেছিলাম। এখানে আত্মীয় পেয়েছো, নিজের বিশাল বাড়ি পেয়েছো, আমার সঙ্গে কথা বলার কোন প্রয়োজন আছে?

নোমান বুঝতে পারলো, রাগের উৎস মুখের বরফ গলতে শুরু করেছে। খুব সতর্কতার সঙ্গে বলে, এখানে তোমার কী কোন অসম্মান হয়েছে?

অসম্মানের প্রশ্ন কেন আসছে?

তোমার কথার মানে তো তেমন ইঙ্গিত-ই বোঝায়।

বাজে কথা বোল না, কথা বলতে আমার মোটেই ভালো লাগছে না।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে নোমান আবার বলে, আচ্ছা, সত্যি করে বলতো—তোমার কী হয়েছে? সেই দিলরুবা আর এই দিলরুবা যেন আকাশ জমিন পার্থক্য।

দিলরুবা কাঁধটা নোমানের দিকে সামান্য ঘুরে কিন্তু মুখটা অন্য দিকে রেখে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বলে, তোমার বাবার বাড়িতে না হয় এসেছো, তাই বলে তোমার সব অতীত ভুলে

www.pathagar.com

গেলে? এই আমি, একটা মেয়েমানুষ হয়ে তোমার জন্যে, তোমার সংসারের জন্যে এমন কী তোমার-আমার সন্তানের জন্য কী না করেছি। অথচ একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে আমাকে একটু জানানো প্রয়োজন মনে করলে না? সবাইকে পেয়ে আমার প্রয়োজনটা তোমার এতো তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল? আমি একটা ভালো স্কুলে চাকুরী করি—যে চাকুরিটা আমাদের কোন রকমে হলেও বাঁচিয়ে রেখেছে। অথচ এখানে আমার পরামর্শ তোমার কাছে মূল্যহীন! আমার ছুটি শেষ, কাল-ই আমি রাজশাহী যাবো।

আর আমরা।

তুমি তোমার বাড়িতে থাকবে, মেহেদীকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাবো।

সারাদিন কথা না বলার কারণটা এখন নোমানের কাছে পরিষ্কার। রাতের আলোচনা তবে কী দিলরুবা আড়ি পেতে সব শুনেছে? কিন্তু ওতো আড়ি পাতার মতো মেয়ে নয়। ও এতক্ষণে বুঝতে পারে, মায়ের কথায় দিলরুবার সঙ্গে পরামর্শ না করাটা উচিত হয় নি। কারণ, এখানে থাকলে দিলরুবার চাকুরীটা বাদ দিতে হবে, অতএব দিলরুবার সঙ্গে আলাপটা অবশ্যই জরুরী ছিল।

নোমান দিলরুবার গায়ে হাত দিতেই যেন সাপের মতো ফুঁসে উঠে। হাত দিয়ে শাড়ির আঁচলটা শরীরের সাথে জড়িয়ে নিয়ে উল্টোমুখে কাত হয়ে বলে, আমার এখন ঘুম আসছে, জ্বালাবে না।

নোমান পুনরায় দিলরুবার হাতের উপরের অংশ ধরার চেষ্টা করে বলে, দেখ, ব্যাপারটা আসলে এতোদূর গড়াবে তা আমি বুঝতে পারিনি। তোমাকে না জানানোটা আসলে আমার, মা'র কারর-ই ঠিক হয়নি।

এবার জোর করে দিলরুবার মুখটা ওর দিকে ঘোরাবার চেষ্টা করে নোমান। দিলরুবা তবু উল্টো দিকেই শুয়ে থাকে? এক সময় নোমান বুঝতে পারে দিলরুবা কাঁদছে। কান্নার সঙ্গে সঙ্গে ওর বুক ও পিঠটা ওঠা নামা করে। কান্নাজড়িত কণ্ঠে দিলরুবা বলে, ভেবে দেখতো তোমার জেলখানার দিনগুলোর কথা। বাবা-মা'কে ত্যাগ করে তোমার সন্তান গর্ভে ধারণ করে একা একা কতো কষ্টে আমার দিন কেটেছে। আমার থাকার কথা ছিল প্রাসাদে—আর আমার দিন কেটেছে কুঁড়ে ঘরে। কিসের জন্যে, কার জন্যে বলো তো? তখন সব চাইতে খারাপ লাগতো যখন চতুর্দিক থেকে প্রলোভন এসে হাতছানি দিয়ে ডাকতো। একমাত্র সংযমকে সাধনায় পরিণত করে ধৈর্যের সঙ্গে সে সব সমস্যার মোকাবেলা করেছি। কেন বলতো? তোমার জন্যে। শুধুমাত্র তোমাকে সাথী হিসেবে পাওয়ার জন্য। সত্যিই আজ বুঝতে পারছি, সেই লোভ করাটা আমার একটু বেশী হয়ে গিয়েছিল।

দিলরুবা আমার দিকটা একটু বোঝার চেষ্টা কর।

তুমি কী সত্যিই যাচ্ছো?

www.pathagar.com

কেন, তুমি জানো না আমার ছুটি শেষ। কাল যোগদান না করলে শেষ সম্বলটাও হারাতে হবে।

তাহলে আমার কোনো কথায় শুনবে না?

শুনবো না কেন, তোমরাই তো আমার কোনো কথার মূল্য দিতে চাও না। এখন ঘুমাও নইলে পাশের ঘরে ছেলেটা সব জেগে জেগে শুনবে।

রাতে ওর নিজের মনের ওপর এতোবড় একটা ঝড় বয়ে গেল সকালবেলা কাউকেও জানতে দিল না দিলরুবা।

বরাবরের মত আজও সকালের চা-নাস্তা বানিয়ে দিয়ে এলো নোমানের ঘরে। শ্বাশুড়ী, দাদীশ্বাশুড়ী সবাইকে সেরে গোসলের ঘরে ঢুকলো।

গোসলে যাওয়ার আগে মেহেদীকে বললো, রাজশাহীর দুটো গেটলক টিকিট কেটে নিয়ায়।

দাদীশ্বাশুড়ী বিষয়টা বুঝতে পেরে আগের দিনের অনেক কাসুন্দি পড়ে নাতবউকে ফেরাবার অনেক চেষ্টা করলো। ইতিমধ্যে বাড়ির দরজায় রিক্সা এসে হাজির। দিলরুবার শ্বাশুড়ী শুধু বললো, এভাবে যাওয়াটা কি ঠিক হচ্ছে বউমা। তা যাচ্ছো যখন, তখন ওকে আর রেখে যাচ্ছো কেন? এখন তো আর আমাদের কেউ নয়, তোমার জিনিস, তুমি সঙ্গে নিয়ে যাও।

রিক্সাতে উঠতে উঠতে দিলরুবা বললো, আমাকে বলবেন না। আপনার ছেলেকে বলুন, আমি কেন যাচ্ছি আর ও কেন যাবে না।

কুঁজো শরীর নিয়ে অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে থাকলো নোমান। বললো, মেহেদীকেও নিয়ে যাচ্ছো?

এখানে থাকলে ওর পড়াশুনা হবে না। তাই ওকে নিয়ে যাচ্ছি।

রিক্সার চাকা ধীরে ধীরে গড়াতে লাগলো। নোমান বিস্মিত-চিন্তিত, মেঘের মতো মুখ করে শুধু একটি কথায় বললো, দিলরুবা, তাহলে চলেই যাচ্ছো?

দিলরুবা কোনো কথা বললো না। রিক্সাটা দেখতে দেখতেই ওর চোখের আড়াল হয়ে গেল। নোমানের মা বললো, খোকা ভেতরে আয়। কিন্তু নোমান ভেতরে না গিয়ে বাড়ির সামনে রাস্তার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর একটা খালি রিক্সা দেখতে পেয়ে হাত তুলে। পায়ের ব্যথাটা গতকাল রাত থেকে যেন আরও একটু বেড়েছে। রিক্সাওয়ালার সহযোগিতায় কোনমতে রিক্সায় উঠে বসলো। রিক্সায় উঠতে গিয়ে তবু সামান্য বুড়ো আঙুলটায় লাগলো। রিক্সাওয়ালাকে বললো, একটু জোরে টেনে যাও।

রাস্তায় যেতে যেতে নোমান অবচেতন মনে ভাবে, সত্যিই বিষয়টা দিলরুবাকে মারাত্মক ভাবে আহত করেছে। দিলে বড় রকমের চোট না পেলে ও কখনও আমাকে ছেড়ে চলে যাবার কথা ভাবতো না। একমাত্র এই মেয়েটার কারণে ও পঙ্গু হয়েও

www.pathagar.com

পৃথিবীর আলো বাতাসে আজ বেঁচে আছে। ও খুব আত্মমর্যাদাশীল মেয়ে। আসল চোটটা লেগেছে ওখানেই।

বাস ছাড়তে এখনও তিন মিনিট বাকি। রিক্সাওয়ালাকে আরও একবার তাগাদা করলো, একটু চালাও ভাই। স্ট্যান্ডের ভেতর থেকে বাসটা বেরিয়ে এসে মেইন রাস্তার মুখে দাঁড়িয়ে। এবার মেইন রাস্তায় বাসের চাকা ধীরে ধীরে গড়তে শুরু করেছে। নোমানের রিক্সা রাস্তার বিপরীত দিকে এসে থামতেই ও দ্রুত নামার চেষ্টা করে। নামতে গিয়ে হঠাৎ পা ফসকে রিক্সার চেইন ঘেঁষে পড়ে যায়। মেহেদী জানালা ধারে বসে ছিল। মা'কে ইশারা করে চিৎকার দিয়ে উঠে-মা... ঐ দেখ বাবা পড়ে গেছে।

দিলরুবা হেলপারকে থামতে বলে। দ্রুত পড়ি মরি করে ছুটে আসে রাস্তার ওপারে। মাটি থেকে টেনে তোলে নোমানকে। রিক্সার ঘর্ষণে মুখের বাম পাশটা সামান্য কেটে রক্ত বেরোচ্ছে। আঁচল দিয়ে মুছে দেয় দিলরুবা। রিক্সাওয়ালাকে বলে, সুটকেসটা নিয়ে এসো। নোমান বলে, কেন রাজশাহী যাবে না?

যেতে আর পারলাম কই।

তাহলে চলে এলে যে?

দেখ, একটা আদর্শকে প্রতিষ্ঠার জন্যে তুমি আমি একসঙ্গে ময়দানে কাজ করেছি। জীবনে অনেক প্রতিকূলতার মাঝে একসঙ্গে অনেকগুলো বছর পার করেছি। তোমরা পুরুষ এতো সহজে সব ভুলে গেলেও একজন নারী কি তা পারে?

সত্যিই বলছো যাবে না?

কেন বিশ্বাস হচ্ছে না।

যদি না-ই যাবে, তবে এমন করে চলে এলে কেন?

নোমানের মুখের ক্ষত স্থানে রক্ত দেখে দিলরুবা আরও একবার মুছে দিয়ে বলে, কেন জানো? তোমার ক্ষতটা মুখে আর আমার ক্ষতটা বুকের পাজরে—তাই দেখতে পাচ্ছো না। আমি চলে গেলে তোমাকে কে দেখবে বলো?

নোমান দিলরুবার হাতটা ধরে বলে, তাহলে আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও?

ছি! অমন কথা বলতে নেই। তুমিই তো আমার সব, তোমাকে ছাড়া আমি কি নিয়ে বাঁচবো বলো? বলে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে। পুনরায় রিক্সায় উঠে দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরলো। নোমান পাঞ্জাবীর প্রান্ত দিয়ে সামনের চোখ দুটো আলতো করে মুছে দিতেই দিলরুবা বলে, আর কখনও আমাকে অমন করে কষ্ট দেবে না।

www.pathagar.com

অন্তায়মান দু'টো হাত

আরমান বাড়িতে আছিস, দরোজাটা জলদি খোল।

দোতলার ফ্লাটে উঠে আসা সিঁড়ির শেষ ধাপটায় দাঁড়িয়ে কথাগুলো বলছিল হৃদয়। ওর চোখে মুখে এসে পড়ছে নিচতলার সিঁড়ি-গলিয়ে ছুটে আসা ম্লান আলোর ছটা। চেহারার অবয়বে দুশ্চিন্তার ছায়া। আরমানকে ডাকবার সময় হৃদয়ের কণ্ঠ গড়িয়ে বেরিয়ে আসে উৎকণ্ঠার ঢেউ। আতঙ্কের তীব্রতা দ্রুত পৌছে যায় দরোজার ওপাশে।

হুট করে শব্দ হলো দরোজা খোলার।

আরো দোস্ত, হৃদয় যে, এতো রাতে?

হৃদয় স্বস্থানে দাঁড়িয়েই বললো, তোর বোনের দারুন বিপদ!

বিপদ, কি বলছিস তুই?

হ্যাঁ। ওর স্বামী, মানে ঔ পাগলা কুত্তাটা ওকে মার-ধোর করে বের করে দিয়েছে বাড়ি থেকে। মমতা আপাকে আমাদের বাড়ি রেখে এসেছি। ঝট্‌পট্ বেরিয়ে আয়, এখনও রক্ত ঝরছে ওর শরীর থেকে।

আরমানের মা নেই। মারাগেছে ও আলোময় পৃথিবীর মুখ দেখবার বছর পাঁচেক পরে। পাশের ঘরে বসে বই পড়ছে বাবা। ঘনিভূত বিপদের কথাটা বাবাকেও বলবার যো নেই। বাবার কানে পৌঁছুলেই রোগটা বেড়ে যাবে। বছর দু'য়েক ধরে শরীরে বহমান উচ্চ রক্তচাপ।

আরমান দ্রুত সিঁড়ি ভাঙছে হৃদয়ের হাত ধরে। গাড়ি বারান্দার নিচে আসতেই খেই খেই করে উঠল দু'টো পশম উঠা নেঁড়ীকুত্তা। আরমানকে চিনতে পেরে মাথা নোয়ালো নিচের দিকে।

www.pathagar.com

ক্রমশ বাড়তে থাকে রাত। পাশাপাশি দুজন নেমে আসে বড় রাস্তায়। সামনে কিছুদূর এগুতেই ডাস্টবিন। ছুটে আসছে উৎকট গন্ধ। পড়ে আছে ময়লা আবর্জনাযুক্ত কাগজ-পলিথিন। হুটোপুটি করে খাবার খুঁজছে কয়েকটা কালো জানোয়ার। রাস্তার পাশ দিয়ে মাঝে মাঝে কানে ঠেকছে ট্রাক ছুটে চলার বেগবান শব্দ। পর পর দুটো পাজেরো পাশ দিয়ে নেমে গেল ঢালু রাস্তায়। দু'জনের চলার গতি বেশ দ্রুত। সামনে কালভাট। কালভাট পেরোয়ে পা রাখলো বাম পাশের ঢালু রাস্তায়। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে, জোড়া ধাতব পিলারের উপর বসে আছে রূপালী ট্রান্সমিটার। মাথার উপর দুপাশে বারো হাজার ভোল্ট বিদ্যুৎ লাইন।

আরমানের মস্তিষ্কে নেমে আসে বিদ্যুতের মত অস্থিরতা। একটি রিক্সাও ভাগ্যের চাকায় মিললো না। কালভাটের বাঁক ঘুরতে একটি খালি রিকশা পেয়েও ছিল, কিন্তু মাথা নাড়িয়ে বললো, যাবোনা বাই, ফিরতী পথের খ্যাপ।

দাঁতে দাঁত পিষে দু'জনে দাঁড়িয়ে থাকে ট্রান্স মিটারের পাশে। পাশ কাটিয়ে গেল কয়েকজন ভিখেরী। হাতে পলিথিনের ঝোলা। ঝোলা ভর্তি শহুরে বাড়ির ভিক্ষে করা খাবার। সোডিয়াম বাতির হলুদ টকটকে আলোয় পলিব্যাগের গা চিকমিকোয়।

আরো কিছুদূর এগোতেই সিনেমা হল। হলের পেছন সাইডে কাঁঠালগাছ। গাছের ছায়ায় মানুষের নড়াচড়া। কারা যেন খুব নিচু স্বরে কথা বলছে,

পঞ্চাশ ট্যাহা দিবা?

তিরিশ দিমু।

তয়লে রাস্তা মাপো।

আরে-মাগী কী কয়?

কি-কই বোজো না? মুরাদ না থাহে কাউড্যা পড়।

মাগীর তো জোবর ত্যাজ হইছে দেখছি। লে-চল্লিশ দিমু- রিকশায় ওড়্।

সিনেমা হলের সামনে রুবি রেস্তরার পাশে ক'জন মাটিতে বসে কোলকেই টান মারে। ধোঁয়ার সাথে ছুটে আসে বিকট গন্ধ। আরমান আর হৃদয় দ্রুত সরে দাঁড়ায়। গন্ধে ওদের বমি আসার উপক্রম।

সিনেমা হলের ওপাশে যেতেই রিক্সা পেল। দু'জনের যেন দেহে প্রাণ ফিরে পায়। রিক্সা চলছে ঢিমে তালে। কিছুদূর পরপর সোডিয়াম বাতির উচুঁ নীরব পিলার। কড়া ফুলের মত ঠিকরে বেরুচ্ছে আলো। হঠাৎ একটা অদ্ভুত ভয় ও বিস্ময় আরমানের বুকের উপর দিয়ে বয়ে গেল। ভাবনাটা সরাতে চাইলেও মস্তিষ্ক ফুঁড়ে বেরোতে চায়না সহজে। ওর বুকের ভেতর ওঠানামা করে সংশয়ের পিস্টন। হৃদয়ে বিদ্ধ হয় বেদনার ফঁনিমণসা। ধীরে ধীরে কুয়াশার পর্দা নেমে আসে পৃথিবীতে। এমন শীতেও আরমানের কপালে চপচপে ঘাম স্পষ্ট। রিকশায় বসে আরমানের দৃষ্টি ফুঁড়ে জেগে উঠে একখানা কচি

www.pathagar.com

মুখ। সে মুখ ছিল সুভ্র-সতেজ। পবিত্র। কাজল-ঘন চোখ। দৃষ্টির কমনীয়তায় ফুটে উঠত ভোরের কুসুম। মমতা ছিল বড় আদরের মা-হারা ছোটো বোন। সফেদ চোয়ালে লেগে থাকতো গোলাপের লালিমা। হাসলে ওর কুন্দ-শুভ্র দাঁতগুলো থেকে ঠিকরে বেরুতো মুক্তর ঝলক। পুরো পিঠ জুড়ে ছড়িয়ে থাকতো মাথা ভর্তি চুল। খোপা বাঁধলে দেখাতো ঠিক একটা বড় পাকা বেলের মত। সেখানে ফুলের তোড়া গুঁজলে অবিকল মনে হতো ফুলপরী। সেই মায়াময় বোন মমতা আজ মরতে বসেছে।

জীবনের খরস্রোতে ভাবলে বড় আশ্চর্য লাগে—এই বোনই মারকুটে লোভী লোকটাকে একদিন ভালোবেসে বিয়ে বসে ছিল। শ্বশুরবাড়ির অঙ্গনে যখন যা চেয়েছে চাওয়ার চেয়ে উপরোন্ত বেশীই পেয়েছে। তবু চাওয়ার সীমাটা মাদকাসক্ত হওয়ায় ক্রমশ বেড়েই চলেছে ওর। শেষমেষ শ্বশুর পক্ষ জব্ দিয়েছে। আরমানের বাবার যুক্তি, প্রেম করে তাদের অনিচ্ছা সত্বেও বিয়ে করেছে। যেখানে দুটো হৃদয়ের দূর থেকে নিস্পাপ প্রণয় ঘনিভূত হয়ে, পরিণয়ের চাদোর মুড়ি দিয়েছে। সেখানে যৌতুক কিসের? তবু কোমলমনা মেয়েটার সুখের দিকে চেয়ে অনেক অ-নে-ক দিয়েছে। ভাবলে অবাক হতে হয়, যে মেয়ের শরীরে কখনও ফুলের আঁচড় পড়েনি—সে কেমন করে সহ্য করে রক্তঝরা অমানুষীক নির্যাতন?

বহু আগেই ওর বরের সাথে কাটান-ছেড়ান করে ফেলতো আরমান। পারেনি শুধু অভাগী বোনটার জন্যে।

ভাবতে ভাবতে ভেতরটা বোনের উপর রুষ্ট হয়ে ওঠে। ফুঁসে উঠে মন। আকাশে ছেঁড়াছেঁড়া মেঘ। এতোক্ষণে জ্যোৎস্না উঠেছে বেশ গোল হয়ে। চতুরদিকে জ্যোৎস্নার রূপোলী চমক। সার সার দেবদারুর ছড়ানো পাতায় মৃদু হাওয়া বাধে। দুটো পাম্পগাছ সামনের পিচরাস্তার মোড়ে। কালো রাস্তা বেশ কিছুদূর পেরোয়ে চোখে লাগে ভূতুড়ে রকম ফাঁকা মাঠ। সামনের বাঁক ঘুরতেই রিকশা সুরকী রাস্তায় নামে। সামনের পথ ঘাটে শুধু জ্যোৎস্নার ঝলমলে গুঁড়ো।

আবেই রিক্শা থাম।

ভাবনার জাল ছিঁড়ে সহসা চম্‌কে উঠে আরমান। সামনে ভাঙা চাল তোলা গোকুলের চায়ের দোকন। চালার নিচে ভূতের মত কয়েকটি ছায়া। আশপাশে দোকানগুলোর ঝাঁপ ভেজানো। ছাউনির নিচের কয়েকটি ছায়া সামান্য দুলে উঠলো। একজন ছায়ামূর্তির গলা ভাঙচুর হয়ে আরমানের কানে আসে। ওর বুক মুচড়ে চেহারায় নেমে আসে ভয়ঙ্কর আকৃতি! প্যাডেলে পা রেখে ব্রেক কোষলো রিক্শাঅলা।

সহসা উড়েচলা মেঘের ছায়া পড়ে চাঁদের গায়ে। নেমে আসে আবছা আঁধার। পাশে বসা হৃদয়কে জড়িয়ে ধরে আরমান। হৃদয়ের মুখ যেন নিস্তব্দ নিথর! আরমানের ভয়ার্ত গলা থেকে অস্ফুটে বেরোয়, কে আপনারা, কী চান?

www.pathagar.com

ছায়াগুলোর ভেতর থেকে সামনে এসে একজন বললো, আমাদের চিনলি না, আমরা গিয়ে হোলাম দ্যাশের বড় মাস্তান। মাস্তানদের দাপট যেখানে শেষ—আমাদের সেখানে শুরু।

হৃদয়ের চোখে অবাক দৃষ্টি! মনের তলে জমে উঠে বিস্ময়ের তলানী। ফুলইউনিফর্ম। টুপির মনোগ্রাম উল্টো দিকে। মুখ দিয়ে ভকভক করে বেরুচ্ছে সস্তা সিগারেটের গন্ধ। আরমান স্বভাব সুলোভ ভঙ্গিতে দুম করে বলে বসে, তবেকি আপনারা পুলিশের লোক? হ্যাঁ, পুলিশ বলেই তো তোদের মত বাটপারদের এতো রাতে পাহারা দিচ্ছি।

এক পর্যায়ে ইউনিফর্মধারী ব্যক্তি আরমানের কাছে গভীর রাতে পথ চলার অভিযোগে কাফ্ফারা চেয়ে বসলো। আরমানের যুক্তির সাথে কথা কাটাকাটি হয় দীর্ঘক্ষণ। শেষের দিকে আরমান হাতজোড় করে বললো, মাফ করে দিন। আমার কাছে তেমন টাকা কড়ি নেই। বোনের বিপদ। তাই হুট করে চলে এসেছি।

পকেটের চিপায় খুঁজে পেলো একটি দশটাকার নোট। কিন্তু দশটাকায় বড় মাস্তানের মন গলে না। আরো চাই। অন্য জন পেছন থেকে কর্কষ গলায় বললো, না দেয় বেঁধে রাখ। দ'ঘা পড়লে ঘল ঘল করে বেরুবে।

হৃদয়ের মানি ব্যাগ কুড়িয়ে পেল দু'শ বারো টাকা। বারো টাকা রেখে পুরোটাই হাতিয়ে নিয়ে ছেড়ে দিলো হৃদয়কে। অর্ধাভাবে ছাড়া পেলোনা শুধু বিপদ শঙ্কুল আরমান।

বারবার মিনতী করে বললো, আমাকে আপনারা আজকের মত ছেড়ে দিন। আমার অসহায় বোনের দারুন বিপদ! ওর শরীর থেকে ঝরছে এক পাষাণের রক্ত। এতোক্ষণ হয়তো সে মরতে বসেছে। বিশ্বাস না হলে আপনারা আমার সাথে চলুন। আরমানের কণ্ঠ গলিয়ে ঝরে পড়ে বেদনার করুণ আহূতি!

ক্রমশ বাড়ছে রাতের গভীরতা। উজ্জ্বল চাঁদের আলো ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে পৃথিবীর বুক থেকে। চতুর্দিকে ছেয়ে যাচ্ছে কুপকুপে কালো অন্ধকার।

আরমানের করুণ মনের আকুতি তবু মিললোনা পাষাণ হৃদয়ে সামান্যতম মমতার ছোঁয়া।

রোলারের কয়েকটি ঘা অযাচিৎ ভাবে এসে পড়ল পিঠের ওপর। শপাং শপাং শব্দে কঁকিয়ে উঠে মেরুদন্ডের হাড়। ভেতর থেকে ঘাম ঝরে নিচের দিকে। ব্যথার কুন্ডুলী ছড়িয়ে পড়ে শরীরের পরলে পরলে। চোখে না দেখা মা, নির্যাতিতা বোন, উচ্চচাপাশ্রিত বাবার সবগুলো মুখ এক সঙ্গে ভেসে উঠে চোখের সামনে। চোখের তারায় যেন ফুটে উঠে দোজখের লাল রঙ!

এতক্ষণে আরমানের ভেতরটা ক্রমশ ঘনিভূত হয়। শক্ত হয়ে উঠে চোয়ালের চামড়া। ফেঁপে উঠে মন। বাহুতে ফিরে পায় কাঙ্খিত বলিষ্ঠতা। দাঁতে দাঁত পিষে উঠে কট্ মট্ শব্দে। সহসা সামনের মানুষটা ক্ষণিকের জন্যে পেছন ঘুরে দাঁড়ালে দ্রুত পাছায় মারে এক লাথি।

www.pathagar.com

লোকটা ছিট্‌কে পড়ল চা-দোকানের জমে থাক উচ্ছিষ্ট পানির গর্তে।

দ্রুত পেছন ফিরে ম্যারাথনি কায়দায় ছুটতে লাগলো আরমান। পেছন পেছন ধূর্ত শিয়ালের মত ধাওয়া করলো তিনজন। রাস্তা দিয়ে কিছুদূর ছুটে চলার পর নেমে আসে মাঠের ভেতর। কিছুটা পথ এগোতেই থেমে যায় আরমানের পথভ্রান্ত দুটো পা। পা আর চলে না। মাটির ভেতর যেন লুকায়িত এক অদৃশ্য চুম্বক শক্তি। ক্রমশ গেঁথে যাচ্ছে সে নরম কাদার ভেতর।

পৌষের অকুল আকাশ। সাড়াহীন নিশুতি রাত। পৃথিবীর গোল পেটে ক্রমশ ঘনিয়ে আসে আবছা কালো অন্ধকার। বাম পাশে কাটা ধানের লাড়াযুক্ত ফাঁকা মাঠ। ডানে যত্রতত্র বস্তির ঘর। শিশিরের বালাপোশে অপরূপ শীত রাতে—ঘুমিয়ে আছে নিস্তব্ধ বস্তির পাড়। শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্মী তিন জন ছুটে আসে পানা পুকুরের পাড়। ঢালু খাদের কিনারে এসে থমকে দাঁড়ায়। ক্ষণিকের জন্যে চমকে উঠে হৃদপিন্ড। ঝিলিক মেরে নেচে উঠে ভ্রুকুটিল চোখের তারা গুলো। অতীব চতুর চোখ স্পষ্ট বুঝে নেয় এখানকার অভাবনীয় পরিবেশ।

দেখতে দেখতে ক্রমশ আরমানের কোমর অব্দি নিচের দিকে নেমে যায়। বুক চিরে বেরোয় কষ্টের শ্বাষ। গালে লাগে ঠান্ডা বাতাস। তির্‌তির্‌ করে কাঁপতে থাকে পাতলা ঠোঁট দুটো । অস্ফুটে বেরিয়ে আসে গগণ বিদারী চিৎকার!

বাঁচাও! বাঁচাও!! তোমাদের কাছে মিনতি আমার আমাকে বাঁচাও! যা চাও তাই দেব, আমাকে শুধু একটি বারের মত বাঁচতে দাও। তিনজন মানুষের গলে না তবু পাষাণ-হৃদয়। দাঁত কেলিয়ে হেসে উঠে—সুরের ঝংকার। হাততালি দিয়ে নেচে উঠে কতক্ষণ।

ছুটে আসে দু'জন বস্তিবাসী ভয়ার্ত স্বরের চিৎকার শুনে। আদিম মমতায় গলে পড়ে মন। পাড় থেকে এগিয়ে দেয় লম্বা বাঁশের ছড়ি। সহসা পেছন থেকে চেপে ধরে হাত।

আমাদের থেকে বড় মাস্তান হয়েছিস না? ভাগ এখান থেকে।

পুলিশের রুষ্ট কণ্ঠে বস্তির লোক দু'জন তবু অনড়।

সরে দাঁড়া বলছি, নইলে তোদের অবস্থাও হবে ওর মত।

বস্তির লোক দুজন সাহস পায় না, আরমানের অবস্থা অনুভব করে। আবছা আঁধারে কিছুক্ষণ চোখ চাওয়া চাওয়ি করে সরে দাঁড়ায় পেছন দিকে। ক্রমশ একটা অনিশ্চিৎ ভবিষ্যত বুঝতে পারে আরমান।

ততক্ষণে ওর গলা পর্যন্ত নেমেগেছে নিচের দিকে। এখন আর চিৎকার বেরোয়না গলার স্বরজু দিয়ে। ধীরে ধীরে নাক গলিয়ে ডুবে যায় কপাল অব্দি। শুধু আকাশ মুখি চেয়ে থাকে অস্তায়মান দুটো হাতের আঙুল।

নিঝুম রাতে যন্ত্রনাক্লিষ্ট মনের সাক্ষী হয়ে জেগে রইল—সপ্ত আসমানের দিকে উদিত দুটো হাত।

www.pathagar.com

দোল নেই দোলনার

হাইরোড দিয়ে গাঁই গাঁই করে বাস ছুটে যাচ্ছে। দোলনা বাস্ট্যান্ডে নেমে দাঁড়ানো রিকশার প্যাড়লারদের ক'মুহূর্ত চেয়ে চেয়ে দেখছিলো। এলাকার পরিচিত একটা হুখোলা রিকশা দেখে ঝটপট উঠে পড়ে। রিকশা চলছে খুব ঢিমে তালে। বারবার কম্পিউটার সিলক-এর আঁচলটা খসে পড়ছিলো কিনারে। রাগ করে সরু কোমরের একপাশে গুঁজে রাখে। মেইন রাস্তা থেকে ডাল রোড সোজা বেরিয়ে গেছে সুন্দরপুর গ্রামে। রিকশায় বসে দোলনা এখনও দেখতে পাচ্ছে যে বাস-টায় ও এসেছিলো তারই পেছনটা। রাস্তার দুপাশ থেকে উঠে আসে হাওয়া। কচি গরমে মনের ভেতরটা একটুও সুখ পাচ্ছিলনা। রুমাল বার করে মুছে নেয় কপালের জমে থাক ঘাম। সামনের বাঁক ঘুরতেই রিকশা গিয়ে নামলো হেরিনবন রাস্তায়। শুরু হলো হ্যাচোঙ হ্যাচোঙ শব্দ। রিকশার হুডসহ কোন কোন সময় উপর দিকে লাফিয়ে উঠে। দোলনার বুকটায় শুধু নড়ে উঠছেনা, বুকের ভেতরটাও অজানা এক আশংকায় থেকে থেকে কেঁপে উঠছে। চোখ ওর ঠিকই ছিল, শুধু যন্ত্রনায় টাটাচ্ছিল মনটা। রাস্তার দুপাশে ঘন-সবুজ আখক্ষেত। প্রগাঢ় আচ্ছন্নতায় ভরে যায় দু'চোখ। দোলনার চোখ যেন কিছু একটা খোঁজে।

ওর স্নায়ুতন্ত্রে ছড়িয়ে পড়ে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধময় শিহরণ। বুঁজে আসে বিবস চোখেরপাতা। চোখের ফাঁকে দেখতে পায় দুহাতে লম্বা বেনী কিশোরী বয়স। কৈশরিক বয়েসটা কাটিয়ে এক সময় বাড়ন্ত শরীরে ফুটে উঠে যৌবনের পদ্মকলির ঢেউ। দেশ ভাগের পর গ্রামের অবস্থা তেমন ভালো না। কারও আত্মীয় নেই-স্বজন নেই। কারও অন্ন নেই-কাপড় নেই, সর্বত্র হা-হাকার অবস্থা।

www.pathagar.com

মুর্শিদাবাদ থেকে নিস্বঃজীবন নিয়ে বদরুল এসে পা দেয় সুন্দরপুর গ্রামে। দোলনার বাবার বাড়িতে জায়গির থাকে। নিযুক্ত হয় দোলনাদের ক'ভাই-বোনের গৃহশিক্ষক। আশপাশের কিছু কিছু বাড়িতেও ছাত্র পড়ায়, কিন্তু থাকে দোলনাদের বোঠক-ঘরে। বদরুলের দু'কূলে আপন বলতে তেমন কেউ ছিল না। দোলনার বাবা এলাকার লোক বলে দয়া পরবস হয়ে ঠাঁই টুক জুটিয়ে দেয়।

বিএ পাশের পর দোলনার বাবাই বদরুলকে সাইন্স ল্যাবরেটরিতে চাকরি নিয়ে দেয়। কিন্তু এখানকার চাকরি মোটেই ভালে লাগেনা ওর। এদিকে দোলনার সাথে সম্পর্কটাও ধীরে ধীরে গভীর থেকে গভীরতর হয়ে আসে। অফিস থেকে ফিরে এসে দোলনার আপ্যায়ন ছাড়া মন ভরে না ওর। না ভরার-ই কথা। দীর্ঘ দিনের নিত্য দেখা-ছোঁয়া মানুষের শান্বিধ্য আট ঘন্টার অফিসে কি মুছে ফেলা যায়? উপরোন্ত টানা চোখের চাহনী সারাক্ষণ ওকে কাছে টানে। কাজের ফাঁকে স্বপ্ন দেখে, গ্রামের অদ্বিতীয় সুন্দরী চঞ্চলা হলুদ পাখিটা হয়তো ওর বুকের খাঁচায় একদিন ধরা দেবে। দোলনাও ওকে ভালোবাসে মন-প্রাণ উজাড় করে। ক্রমশ ওদের মনের ব্যাপারটা পারিবারিক ভাবে সাভাবিকতায় নেমে আসে।

ভাত নিয়ে বোসে থাকে দোলনা। কখন বেজে উঠবে বদরুলের বাজানো সাইকেল বেল-এর শব্দ। নিত্য ধরা-ছোঁয়ার পরও এ আকাঙ্খা মুহূর্তের জন্যও মুছে যায় না। মুখোমুখি দেখা হলেই ওর গাঙশালিকের মতো নিবিড় চোখ দুটোর দিকে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকে বদরুল। দোলনা ঘাড় তুলে মিষ্টি করে বলে, কি দেখছো গো অমন করে?

বদরুল ওর কানের দুপাশে হাত ছুঁয়ে কুঁচরঙা ঠোটে কড়া করে একটা চুমু বসিয়ে দেয়।

লজ্জায় লাল হয়ে দোলনা আশপাশে চেয়ে ঠোঁটটা আলতো করে মুছে ফেলে। বদরুল ওর দূরন্ত হাতটা খপ করে চেপে ধরে বলে, কী দেখি বোঝ না, কর্মময় দিনের ক্লান্তি শেষে প্রতি দিন-ই তোমায় নতুন লাগে।

মাদুর পেতে দেয় দোলনা। ভাত খেতে খেতে বদরুল বলে, এ চাকরিটা আমার তেমন ভালো ঠেকছেনা। ভার্সিটিতে একটা এ্যাপ্লাই করেছি। তুমি চাচাকে একটু বললে...

দোলনার মুখে এ কথা শুনে ওর বাবা বলেছিলো, চাকরীতো তেমন সোজা জিনিশ নয়রে মা, তবে দেখব চেষ্টা করে। দোলনার পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত চাকরীটা যোগাড় করে দিতে সক্ষম হয়েছিলো ওর বাবা।

নতুন কর্মস্থলে যোগদানের ঠিক একমাসের মাথায় ওদের বিয়েটা হয়ে গেল। দোলনা খেয়াল করে এ চাকরীটা ওর পছন্দ হয়েছে। ছাত্র পড়িয়ে পড়িয়ে ও বেশ অলস হয়ে গিয়েছিল। কায়িক পরিশ্রম দীর্ঘক্ষণ সহ্য হয় না। এখন সকালে যায়, ছ'ঘন্টা হতে না হতে ফিরে আসে। সামান্য স্বর্দি-কাশি হলে খাতা সই করে চলে আসে দিনের মতো। সারাদিন দোলনাকে নিয়ে ঘরে বসে কাটায়।

www.pathagar.com

প্রথম দিকে চাকরীটা ছোট হলেও এখন সে রীতিমত সেকশন অফিসার। ঝর্ণার পানির মতো সময় ক্রমশ গড়াতে থাকে। বসন্তের হাওয়া দেলনার জীবনে নতুন করে দোল খায়। কানাই কানাই উপচানো সুখ দেখে ওর আপন বোনও হিংসে করে। দুটো বাচ্চা হলে দোলনার বাবা ওদের আলাদা করে বাড়ি বানিয়ে দেয়। বাড়ির সামনে এক পাশে গোলাপ, অন্য পাশে রকমারী ফুলের বাগান। বদরুল শুধু বাগান করে খালাশ। ছেলে-মেয়ে, সংসার সামলে অবসরটুকু গাছের পরিচর্যায় কাটিয়ে দেয় দোলনা। নতুন একটা ফুল ফুটলে অমনি কিশোরীর ভঙ্গিতে স্বামীকে টেনে এনে দেখায়। দোলনা মানুষটাকে ভালো বাসে নেশার মতো। ওর বাবা দীর্ঘক্ষণ মায়ের কবরের পাশে বসে থাকলে দোলনা জোর করে টেনে আনতো। বাবা তখন বলতো, মা'রে, কেন যে ছুটে আসি তুই বুঝবি না। শুধু মদ খেলেই নেশা হয় না, ভালোবাসায়ও এক ধরনের নেশা থাকে। যা আকণ্ঠ পান করলেও ইচ্ছে শক্তি লোপ পায় না।

কিন্তু সে সুখ আর দোলনার নেই বললেই চলে। ভালোবাসার নেশাটা সহসা ওকে যেন মুক্ত করে দিচ্ছে। সে দিন দাওয়াখানা থেকে ফেরার পথে অঘটনটা ঘটে গেল। তখন সবেমাত্র সন্ধা নেমেছে মায়াবী পৃথিবীর উপর। চতুর্পাশ থেকে রাস্তায় উঠে আসে ঘটঘুটে অন্ধকার। বাড়ির কাছাকাছি আসতেই দোলনা শুনতে পায়, নিচু স্বরে কথা। বাড়ির সামনেই ছিলো একটা ঝাঁকড়া অর্জুনগাছ। গাছের নিচে নড়ে উঠে নীরব দুটো ছায়া। পাশেই রাস্তার ধার-ঘেঁষা তারাপাম্প। ধরিত্রী মাঝে নেমে আসে আকাশ থেকে নক্ষত্রের হালকা আলো। দোলনা ছায়া দুটোর মাঝে দেখতে পায় নীরব, অধুরা এক ব্যবহারিক ভাষা। যে ভাষায় একটা প্রেম-পিয়াসী ঘুঘু অন্য একটি ঘুঘুর চঞ্চুতে চঞ্চু লাগিয়ে কামনার আগুনে পুড়ে মরার লালসা ব্যক্ত করে। দোলনার তীব্র কণ্ঠের ঝাঁঝালো দাবদাহে, দুটো মানুষই ভূত দেখার মতো আচমকা সরে দাঁড়ায় দু পাশে। ছোট কাল থেকে নিত্য দেখা ছোঁয়া মানুষটি চিনতে ভুল হয়না দোলনার। মেয়েটি পাশের বাড়ির। নাম কহিনূর। বয়েস সবে মাত্র ষোল-সতেরই ছুঁয়েছে। দোলনার মুখ দিয়ে আচানক গাল উঠে আসে। খানকী মাগী, বয়েস কম হলে কী হবে, অল্পতেই পেকে গেছে। এতো ভাতারের সখ তো বাছুর দেখে ধরতে পারিস না।

পরে কহিনূরের বাবাকে দোলনা একদিন বলেও ছিলো। কিন্তু বৃদ্ধ শুখা গলায় ওকে জানায়, মেয়েটা সেদিনও ন্যাংটা হয়ে তোদের সামনে ব্যাড়ালো। ক'দিনেই তড়াক করে বড় হয়্যা গেল। হামারওতো মন চাই ওকে বিহ্যা দিতে। তো সেই সামর্থ কী আল্লাহ্ হামাকে দিয়্যাছে? সামান্য মুরগী ব্যাচা পায়সা, কোনদিক সামলাবো তোমরায় বলো মা?

দোলনা সেদিনের মতো স্বামীকে কিছুই বললো না। শুধু গর্তে পড়ে যাওয়া গোখরা সাপের মাতো সারা রাত উল্টো পিঠে ফুঁসেছে। এতো কালের জমানো ভালোবাসা যেন বরফ গলা ঝর্ণার মতো গলতে শুরু করেছে।

www.pathagar.com

একদিন দোলনার ভীষণ জ্বর। চোখ-মুখ উল্টে শুয়ে আছে। বদরুল অফিসেও যায়নি। দোলনা চোখ মেলে দেখে, ওর শরীরে ভেজা কাপড়ে ম্যাসেজ করে দিচ্ছে-সয়ং কহিনূর। কোনো কথায় বেরোতে চাইলোনা—দোলনার মুখ দিয়ে। কম্পমান ঠোঁট দুটো শুধু কয়েকবার উপর নিচ করলো। ধোয়া পোছা সব কিছুতেই কহিনূরের হাতের স্পর্শ। ক্রমশ পরিবারের সকলেই কহিনূরের বিনয়বনত ব্যবহারে মুগ্ধ। কেবল দোলনার মনের একান্ত নিভৃতে দোল খায়—এমন ঘনিষ্টতার মানে কী?

ক'দিন ধরে এক, অপ্রতিরোধ্য ব্যথায় কনকনিয়ে উঠে দোলনার ভেতরটা। অতৃপ্তির চুঁয়ানো ঢেকুর বিষাদময় মনের কোণে সর্বক্ষণ জেগে থাকে।

কোহনূরের সন্দেহটা গাছপোকার মতো কুটকুট করে কাটছে ওর বুকের পাঁজর। ঠোঁট নাড়িয়ে এসব কথা বলা যায় না। মুখ বড় খারাপ জিনিশ। মুখের ভাষা অনেক সময় সংসারে আগুন ধরায়। তবু সাহস করে দোলনা বলেছিলো, মেয়েটার সাথে কি এমন তোমার খাতির গো, সব সময় হেসে হেসে কথা বলে?

দোলনার এই এক স্বভাব। এক কথার সূত্র পেলে হাজার কথা বার করে। অথচ বছর দশেক আগেও দোলনা এমন ছিল না। সেছিলো শিশিরে মাখা আদুরে শিউলি। ওর ঠোঁটময় ফটিকস্বচ্ছ হাসি জোসনার আলোর মতো ভেসে যেত বাতাসে। তখন বুকের দুপাশ তড়পাতো বদরুলের। চোখ জুড়ে ছড়িয়ে থাকতো সুগন্ধি ফুলের নেশা। এমন বউ ওর ভাগ্যের সাথে মানায় না। লোকে জানতো বদরুল বউ-পাগল মানুষ। বউকে দেখে ওর চোখ দুটোয় ছড়িয়ে পড়ত নতুন কুশি গজানোর উচ্ছাস। দোলনা আয়ত গভীর চোখ হৃদয়ের উচ্ছাস ফুটিয়ে কবুতর নরম গতরের বিশাল ঐশ্বর্যময় আবেদনে কাছে ডাকতো বদরুলকে। দোলনার আঠার উনিশ বছরের বাড়ন্ত বুকে তখন আছড়ে পড়তো হাঁপরের ঘা। বদরুলকে নির্জনে ডেকে এনে মিষ্টি করে বলতো, হাঁগো, এখানে এমন করে তড়পায় কেন?

বদরুল বুকের সাথে চেপে ধরে ওর চিবুকটা ঈষ্যত কচলে দিয়ে বলতো, ওটা একা একা থাকে তো-তাই। দোলনা তখন লজ্জামিশ্রিত মুখে হেসে কুটি কুটি হয়ে যেত। বলতো, তুমি কথার যাদু জানো। দোলনা এখন আর তেমন বাইরে বেরোয় না। সব সময় প্রহরীর মতো চোখ কান খোলা রাখে। কহিনূরের তিরতিরে নূরের আলোয় কখন বা ওর মূল্যবান সম্পদ ঝলসে যায়—এ আশংকায়। কালের গর্ভে ক্রমশ ছেড়া-ফাটা দিনগুলো পেরুতে থাকে। একদিন খবর আসে মুর্শিদাবাদ থেকে। ওর বড়চাচা বিছানা নিয়েছে। দেখতে না গেলেই নয়। তো কোলের বাচ্চাটা সঙ্গে নিয়ে তিন দিনের জন্যে ভারত অভিমূখে যাত্রা করে।

শরীর হাত ঝিমঝিম করছে রিকশার ঝাঁকুনিতে। বুকটা কেমন টিবটিব করছে। চোয়াল জেগে উঠা মুখটায় দুশ্চিন্তার ছায়া। অসহ্য যন্ত্রণার আকাশ ক্রমশ ঘনিভূত হয়ে আসে! রিকশা এবার হেরিনবন রাস্তা শেষে ঢালু রাস্তায় নামে। দুপাশের বাঁশ ঝাড় থেকে উঠে

www.pathagar.com

আসে ঝিরঝিরে হাওয়া। তবু বুকটা ফেঁপে উঠে গরমে। এক মাঠ রোদের মধ্যে জোড়ায় জোড়ায় খেলে বেড়াচ্ছে দোয়েলগুলো। দেখলে বুকের ভেতরটা কেমন ঈর্ষায় জ্বলে উঠে। কী এমন দোষ ছিলো ওর, যার জন্য পার্থিব সুখটুকুও সৃষ্টিকর্ত্তা কেড়ে নিলো?

রিকশা ঠিক বাড়ির সামনে অর্জুন গাছটার নিচে এসে থামলো। দোলনা চার পাশে তাকিয়ে দেখলো, থকথকে কালো অন্ধকার। অন্ধকার পেরোয়ে ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে পা বাড়ায়। কিন্তু একি! বাড়িতে তেমন কোনা সাড়া শব্দ নেই। রাত্রী ওতো খুব একটা বেশী হয়নি। দোলনা ওর শোবার ঘরের কাছে এসে আচমকা থমকে দাঁড়ায়। সহসা সমস্ত নিরবতা ভেদ করে শুনতে পায়, কাচের চূড়ির মতো উপচেপড়া হাসি। হঠাৎ ভেতরটা ধক্ করে উঠে! ভেজানো দরজার ফাঁক গলে চোখ যায় ভেতরে। ওর নিত্য শোয়া-বসা বিছানা আজ ওর-ই অনুপস্থিতিতে ফুলে ফুলে সাজানো। স্বামী নামের কাল-নাগটার বুকের উপর উবু হয়ে শুয়ে আছে কহিনূর। যেমন ভাবে ও নিজেই একদিন শুয়ে ছিলো। মুহূর্ত বিলম্ব না করে চোখ ফিরিয়ে নেই দোলনা। মনে হলো লাথি মেরে সব কিছু তছনছ করে ফেলে। কিন্তু ততক্ষণে ভেতরের উচ্ছাস কোনো এক অদৃশ্য কারণে বুজে গেছে। আবোধা পা দুটো যেন ক্রমশ নিচের দিকে গেঁথে যাচ্ছে। বিবস হয়ে আসে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। ভেঙে যায় বুক। স্থিতু হয়ে আসে বুকের পাঁজর। আজ হঠাৎ করেই থেমে যায় দোলনার—সাজানো জীবনের ছন্দময় দোল। যেখান থেকে ওর সুখময় জীবনে দোলের উৎস, আজ সেখানে এসেই যেনবা থেমে যায়।

মানুষের মনের কথা ভেসে উঠে চেহারায়। আর মনের ব্যাকুলতা প্রকাশ পেলে তা কখনও আমের আটির মতো লুকানো থাকে না। ধীরে ধীরে দোলনার ভালোবাসা, অনুভবরের স্নায়ুগুলো রোদেপোড়া মৃত্তিকার মতো শুকোতে থাকে। বুকটা ঘনঘন ওঠা-নামা করে শ্বাসকষ্টে।

বাঁশ ঝাড়ের পাশ থেকে ছুটে আসে ঝিঁঝি পোকার নাগাড়ে ডাক। অশ্রুকণিকায় উপচানো চোখ দোলনা সেই গুঞ্জরিত শব্দের ভেতর, বানভাসী মানুষের মতো নিজেকে খুঁজে ফিরে।

www.pathagar.com

কৃষ্ণপুরের রাধিকা

সুলতান! এই সুলতান!!

পাশ থেকে কোনো এক নারীকণ্ঠ নাম ধরে ডাকতেই চমকে ওঠে সুলতান। পরিবেশ বিষয়ক এক সেমিনার ছিল রংপুরে। সেমিনার শেষে বাড়ি ফিরছিল ট্রেনযোগে। তখনও সান্তাহার স্টেশনে পৌঁছেনি। ঠিক এই মুহূর্তে অতি পরিচিত কণ্ঠের ডাক। চোখ তুলে তাকাতেই বুকের ভেতর অনুভব করে ইথারে ভেসে আসা কম্পমান দ্রিম দ্রিম শব্দ। বয়ে যাওয়া ঝড় শেষে বিধ্বস্ত উপত্যকায় নীরব শূন্যতা। মনে মনে ভাবে, এতো গুলশান। এখানে এলো কোথা থেকে? পরণে আকাশি নীল শাড়ি। জমিনে হালকা লাল রঙের তুলির আঁচড়ে ছাপা ফুল। গায়ের রঙের সঙ্গে মানিয়েছে চমৎকার। তবে চেহারায় বয়সের না হলেও, মানসিক একটা মলিনতার ছাপ স্পষ্ট। সুলতান ভেতরটা সামলে নিয়ে বলে,

কাকে বলছেন?

আপনাকে।

না, আপনি ভুল করছেন। আমি সুলতান না।

মেয়েটির চেহারায় রহস্যময়ি হাসি খেলে ওঠে। বলে, দশ বছর আগের রাগ এখনও কমেনি?

আহ্-হা, আপনি আবারও ভুল করছেন। আমি এ নামের কেউ নই। আমি একজন অতি সাধারণ শিক্ষক। আপনার মতো কোনো মেয়েকে আমি চিনি না।

আমি সেই শিক্ষক সুলতানের কথা-ই বলছি।

দেখুন শিক্ষক ঠিক আছে, তবে আমি আপনার জানাশুনা সেই সুলতান নই।

www.pathagar.com

ও বুঝেছি। দশ বছর আগের এমনি এক ট্রেনের সেই প্রতিশোধটায় আজ কড়ায় গন্ডায় আদায় করছেন, তাই না?

দেখুন আমি চাই না চলন্ত ট্রেনের পরিবেশগত ভারসাম্য ক্ষুণ্ন হোক।

সুলতান আমার কথা শোনো প্লিজ! তোমার দোহাই লাগে, শুধু একটি বার আমার কথা শোনো। এরপর তুমি কথা বলতে না চাইলেও আমি কিছু বলবো না।

কয়েকজন যাত্রী উঠে যাওয়ায় গুলশান এসে সুলতানের পাশের খালি সিট-টায় বসে। গুলশানের শেষের দিকে অনুরোধমাখা কথাগুলো শোনার পর সুলতান বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

ভেতর থেকে বাজতে থাকে তার বিহীন সেতারের সুর। এতো আজ থেকে দশ বারো বছর আগের সেই গুলশানারা ওরফে রাধিকা। যার পদভারে মুখোরিত হয়ে আলো ছড়াতো ওর জীবনের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে। সুলতান ক্ষণিকের জন্যে ট্রেনে বসেই ওর জীবনপঞ্জির পেছনের দিকে ফিরে তাকায়।

॥দুই॥

গ্রামের নাম কৃষ্ণপুর। সেই গ্রামের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে গুলশানারা। ওদের কয়েক বাড়ি পরে মাজেদ মাস্টারের বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করতো সুলতান। মাজেদ মাস্টার ছিল সুলতানের বাবার বন্ধু। প্রথমত, কৃষ্ণপুর স্কুলে দু'জন এক ক্লাসের লেখাপড়া করতো। দু'জনে একই সঙ্গে ভালো রেজাল্ট করে পাশ করে। অতপর নওগাঁ সরকারী কলেজে একসঙ্গে নতুন করে লেখাপড়া শুরু করে।

তাদের কৃষ্ণপুরের স্কুলটি ছিল ছোট নদীর ওপারে। তাই নৌকোয় চড়ে নদী পার হয়ে স্কুলে যেতে হতো। এই পারাপারকে কেন্দ্র করেই ওদের মন দেয়া-নেয়ার সূত্রপাত ঘটে।

একদিন বড় নৌকোয় বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রী পার হচ্ছে। শ্যামল মাঝি বৃদ্ধ হলেও দাঁড় টানে বেশ জোরে। একপাশে গুলশানারা ওর বান্ধবীদের সঙ্গে, গোলুইয়ের ধারে বুকের সঙ্গে বইগুলো চেপে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। অপর প্রান্তে ছেলেদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে সুলতান। হঠাৎ দাঁড় টানার ভঙ্গিগত কারণে নৌকোটি কিছুটা হলেও ধাক্কা খেয়ে নড়ে ওঠে। গুলশান সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে নৌকার খালি অংশে পড়ে যাবার উপক্রম। তেমন একটা ঘনিষ্ঠতা না থাকলেও একমাত্র সুলতান-ই ছুটে গিয়ে পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে গুলশানকে। আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা পেল বটে, তবে দু'জন দু'জনের দিকে চেয়ে থাকে দীর্ঘক্ষণ। বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে থাকতে একসময় দু'জনই মিষ্টি করে হেসে দেয়। এ এক হৃদঘচিত স্রষ্টার অপার মহিমা। এক পর্যায়ে নৌকোর সকল ছাত্র-ছাত্রীই হো-হো করে হেসে ওঠে!

হঠাৎ সুলতান খেয়াল করে গুলশানের কলমটি মধ্য নৌকোর পানিতে ভাসছে। আর গুলশান তা চাইতে না পেরে লজ্জাবনত চেহারায় চেয়ে আছে কলমটির দিকে। সুলতান

www.pathagar.com

পাটাতন থেকে নিচমুখে উবু হয়ে তুলে আনে নীল রঙের হোয়াইট ফেদার কলমটি। আলতো হাতে এগিয়ে ধরে গুলশানের দিকে। আবার সেই গভীর কালো চোখের দৃষ্টি বিনিময়।

এই নদীর ঘটনা থেকেই দু'জনের হৃদয়ঘটিত সাঁতার কাটা শুরু। কৃষ্ণপুর স্কুলের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ফিগার আর সুন্দরী মেয়ে গুলশান। তাই সবাই তাকে কৃষ্ণপুরের রাধিকা বলে ডাকে। আর নৌকায় ঘটে যাওয়া এ ঘটনা থেকে সুলতানকে সেই রাধিকার কৃষ্ণ বলে ডাকার কানাঘুষো চলতে থাকে।

এমনিভাবে দু'জনের জীবনের ঘনিষ্ঠতা, হৃদয়ের আতিথেয়তা, দৃষ্টির চতুরতা ক্রমশ বাড়তে থাকে। তবে আর যাই হোক পড়াশোনাকে শীর্ষে রেখে ওদের জীবনের বাকি ঘটনাগুলো স্বাভাবিকভাবে এগুতো। কৃষ্ণপুর গ্রামের সামাজিক কর্মকান্ডের সবকিছুতেই সুলতানের প্রাধান্য ছিল যথেষ্ট। এক সময় সুন্দর ব্যবহার-ই গ্রামের মধ্যমনিতে পরিণত করে তাকে।

তবে, জীবনের সবচেয়ে বড় ধাক্কাটি খেল মাত্র দু'বছরের ব্যবধানে। পুরুষ জীবনের সবচেয়ে কঠিনতম সময় সম্ভবত লেখাপড়ার শেষে—আর চাকরী পাওয়ার পূর্ববর্তী মাঝের এই 'সন্ধিস্থল' সময়টুকু। এই সময়টা বিশেষ করে গুলশানের কথা ভেবেই, চাকরীর জন্য হন্যে হয়ে খুঁজে ফেরে সুলতান। দু'টি বছর কেটে যায় ভীষণ ব্যস্ততার মাঝে। একসময় সুলতানের চাকরী হয় একটা ভালো কলেজে। কিন্তু যখন এ সংবাদ নিয়ে সুলতানের ছুটে যাওয়ার কথা কৃষ্ণপুর গ্রামে—ঠিক তখনই জানতে পারে, কোনো এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ীর সঙ্গে বিয়ে হয়েগেছে কৃষ্ণপুরের রাধিকা গুলশানের।

একদিন শান্তাহার অভিমুখে ট্রেনে যাচ্ছিল সুলতান। সামান্য ঝিমুনি আসে চোখেমুখে। রাণীনগর স্টেশন থেকে ট্রেন সবেমাত্র ছেড়েছে। চট করে ঘুমটা ছুটে যায় ফেরিকরা বাদামওয়ালার ডাকে। হঠাৎ তার সামনের সিটে দেয়ালঘেঁষা আসনটিতে দৃষ্টি যেতেই চোখ দুটো রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে থেমে যায়। ভুল দেখছে নাতো। আরও একবার চোখ দুটো কচলে নেয় ভালো করে। উমহু সেই চোখ, সেই মুখ, তেমনি তীক্ষ্ণ নাসিকা। চোয়ালের পাশে জোড়াতিল আরও অম্লান। এই তিলের কথা ও একদিন বলেছিল তাকে—পারস্যের কবি তার প্রিয়তমার কপোলের তিলের বিনিময়ে বোখারা ও সমরখন্দ বিলিয়ে দিতে চেয়ে ছিল। ঠিক আগের মতোই মাথার এক লাচি চুল গাছের শাখা থেকে ঝুলন্ত আলকলতার মতো কপালের কিনার বেয়ে আজও ট্রেন জানলার বাতাসে দোল খাচ্ছে। এমনি সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে সহসা মুখ থেকে অস্ফুট বেরোয়ে আসে,—গুলশান!

সামনের আড়াআড়িভাবে বসে থাকা মেয়েটির জানলা-ফেরৎ ধূসর মুখখানা ওর দিকে তাকায়। এনার্জি বাল্বের টকটকে আলোর মতো মেয়েটির চেহারায় জ্যোতির্ময় হাসি ঝিলিক দিয়ে ওঠে। সুলতান ওর চেহারায় হঠাৎ আলোর ঝিলিক দেখেছিল ঠিক-ই,

www.pathagar.com

তবে ঐ একবার-ই। পরক্ষণে সেই জ্যোতির্ময় হাসির ঝিলিক কোনো এক অদৃশ্য হাত যেন ছোঁ মেরে উধাও করে দেয়। আকাশের কালো মেঘের তান্ডব ওর সমস্ত চেহারায় এসে উধাও হয়ে যায়। গুলশানের পাশে বসা খাটো-মোটা লোকটি ওর কাঁধে রাখা হাতটি আলতো করে সরিয়ে নেয়। সম্ভবত ওর স্বামী। ভোতা মুখে এই লোকটিকে দেখে সুলতানের মেজাজটা আরও তিরীক্ষি হয়ে ওঠে। ওর দৃষ্টিতে যে ছিল দেশের সেরা সুন্দরী, যার খেতাব ছিল কৃষ্ণপুরের রাধিকা সেই রাধিকা আজ এমন একটা বে-ঢক আকৃতির মানুষের সাথে ঘর করছে?

মেয়েটি এবার সুলতানের দিকে তাকিয়ে বলে, দেখুন, আপনি ভুল করছেন। আমি আপনার জানাশোনা কেউ নই।

সুলতান মরিয়া হয়ে ওঠে। কেন আমাকে চিনতে পারছো না। আমি সেই সুলতান। এক-ই পাড়াতে আমরা থাকতাম।

বললাম তো আপনি ভুল করছেন। আমি আপনাকে চিনি না।

আরও একবার সুলতান চোখ তুলে তাকালো। পাশে বসা খেবড়ো মূর্তির মতো চেহারা মানুষটি ওকে কোমল পানীয়ের বোতলটা ধরিয়ে দেয়। গুলশান ঢক্ ঢক্ করে বোতলের অর্ধেক খালি করে। কেমন একটা হাঁসফাঁস ও অস্বস্তি অনুভব করে বুকের ভেতর। গুলশানের কপাল থেকে দরদরিয়ে বেরিয়ে আসে ঘাম।

সুলতান ভাবে, এমন তো হবার কথা ছিল না। বিয়ে যে ও করেছে এটা সে জানে। কিন্তু ও যে, একেবারে চিনতে চাইবে না, কথা বলবে না—এ ব্যাপারটা ওকে আশ্চার্যান্বিত করে তুলেছে। ততক্ষণে ট্রেন এসে ভিড়েছে সান্তাহার জংশনের দু'নম্বর প্লাটফর্মে। ক্ষোভ আর দুঃখে বাংকার থেকে সাইডব্যাগটা এক ঝাটকায় টেনে নিয়ে সুলতান একবারও ওর দিকে না তাকিয়ে ট্রেন থেকে নেমে যায়। যার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছিল সারাজীবন ঘর বাঁধবে না—সেই তাকে আজ চিনলো না?

॥তিন॥

আজ দশ বছর পর কেমন কাকতালীয়ভাবে দেখা হয়ে গেল গুলশানের সঙ্গে। তাও আবার ঐ রাণীনগর স্টেশনের একই ট্রেনে। গুলশান যখন অসংখ্যবার অনুরোধ করে বলতে লাগলো, সুলতান প্লিজ, আমার কথা শোনো। আমাকে বলতে দাও, তারপর তোমার যা খুশি তাই করো। ঠিক তখনই সুলতান টিস্যু পেপারের মতো ফ্যাকাশে-বিবর্ণ-মলিন মুখখানার দিকে চোখ তুলে তাকায়। বিস্ময় মাখা চেহারায় পলকহীন চেয়ে থাকে গুলশানের দিকে। . . . একি হয়েছে তার সেই কৃষ্ণপুরের রাধিকার চেহারা! দীর্ঘক্ষণ চেয়ে থেকে ভেতরটা শক্ত করে বলে, এবার বলো, কি বলতে চাও—তবে খুব সংক্ষেপে।

সহসা চমকে উঠে গুলশান! সুলতান বিশেষ করে ওর সঙ্গে কথা বলার ব্যাপারে "সংক্ষেপে" শব্দটা জীবনে এই প্রথম ওর সামনে উচ্চারণ করলো। গুলশান ঢোক গিলে

www.pathagar.com

নিজেকে সামলে নিয়ে বলা শুরু করলো। তোমার বেকারত্বের সুযোগে বাবা-মা'র ইচ্ছের কাছে শেষ পর্যন্ত নিজেকে উৎসর্গ করলাম। বিয়ের মাস ছয়েক না পেরুতেই আমার এক আত্মীয় তোমার-আমার সম্পর্কের বিষয়টা আমার স্বামীর কাছে ফাঁস করে দেয়। তারপর থেকে ও আমাকে মুখে কিছু না বললেও খুব সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে। আজ থেকে দশ বছর আগে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয় ট্রেনে। সে তখন আমার পাশেই বসা ছিল। আমি তোমাকে না চেনার ভান করলেও, সে ঠিক-ই সব বুঝে ফেলে। বাড়ি গিয়ে আমাকে হাজারো প্রশ্ন। আমি কোনো কোনোটা সত্যি বললেও সে তা মানতে চায় না। ঐদিন রাতেই রিমান্ড শুরু হয় আমার শরীরে। কোমরের বেল্ট খুলে সমস্ত শরীরে চাকা চাকা ছাপ বসিয়ে দিয়েছে। প্রতিদিন টর্চারিং-এর মাত্রা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। মাঝে মাঝে মূর্ছা লেগে পড়ে থাকতাম—তিনি ঘন্টা, চার ঘন্টা ধরে। এমতাবস্থায় স্বয়ং আমার ননদ সহ্য করতে না পেরে নিজে সঙ্গে করে বাবার বাড়িতে পৌঁছে দেয়। সেই থেকে কৃষ্ণপুরে অবস্থান।

সেদিন তোমাকে ইচ্ছে করে এই ট্রেনে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলেও, আমার শেষ রক্ষা কিন্তু হয়নি। এটাই বুঝি আমাদের সমাজে নারী জীবনে সার্থকতা। নিজের অনিচ্ছায় ঘর বেঁধে, সেই ঘর নিজেই প্রাণান্তকর চেষ্টা করেও পারলাম না রক্ষা করতে। তবে আমার জীবনের বাঁক নতুন করে মোড় নিয়েছে। আবিষ্কার করেছি নিজেকে অন্যভাবে। নিজের পথ চলার রাস্তা নিজেই তৈরি করেছি। নরপশুটা দু'বছর পর এসেছিল মাফ চাইতে। ওকে দেখা মাত্র ওর দেয়া আঘাতের ব্যাথাগুলো সমস্ত শরীরে জেগে উঠে। তোমাদের মতো পুরুষ হলে হয়তো একটা শোধ নেবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু আমরা নারী, তাই হাত তুলতে পারিনি। ঘৃণা-ক্ষোভ-দুঃখে ওকে চিরদিনের মতো তাড়িয়ে দিয়েছি। সেই থেকে শুরু একলা পথচলা। কিন্তু ওপথের কোনো শেষ নেই সুলতান। আজ আমি পথ চলতে চলতে বড় ক্লান্ত, শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। ঠিক এমনি একটা সময়ে আজ তোমর সঙ্গে দেখা। সেই থেকে এ পথে এসে প্রতিদিন রাণীনগর স্টেশনে আসি—আবার ফিরে যাই। অন্ততঃপক্ষে পুরোনো দিনের অধিকার নাইবা পেলাম কিন্তু তোমাকে না চেনার যে ভুল করেছিলাম, তার থেকে ক্ষমা চাওয়ার সুযোগটা তো পাব? এবার বলো, তোমার বউ কেমন আছে, ছেলেমেয়েরা ক'জন।

তুমি কি করে ভাবলে, বিয়ে যদি করেও থাকি, তার হিসেব তোমাকে দিতে হবে?

আমি জানি, তুমি আমার উপর ভীষণ ক্ষেপে আছো। তাই বলে আঘাত দিয়ে কথা বলা কি ঠিক হচ্ছে? সত্যিই যদি তোমার কোনো এক জনমে আমি রাধিকা হয়ে থাকি, তবে অধিকার অবশ্যই আছে।

এই বলে মুখটিপে মুচকি হাসে গুলশান।

সুলতান ভাবে, যতই গুলশানের সঙ্গে কথা বলছে, ততই ওর কঠিন হৃদয়টা ক্রমশ শিথিল হয়ে আসছে। নিজের ভেতর অনুভব করে, চারদিক থেকে ছুটে আসা এক ক্লান্তি

www.pathagar.com

র নীরবতা। কিন্তু সে তো তা চায়নি। ওর সঙ্গে দেখা হলে সিদ্ধান্ত ছিল, মুখ ফিরিয়ে নেয়ার। নিয়েছিলও তাই। কিন্তু কেন সবকিছু আজ দুর্বল মনে হচ্ছে তার? এ কিসের শক্তি, যা অনুভূতিতে কাজ করে না? আবার দৃষ্টি মেলেও দেখা যায় না। অথচ এখনও পর্যন্ত ওর চেহারাটার দিকে চোখ তুলে ভালো করে তাকিয়ে দেখেনি। তাহলে কী ঐ যে, তোমার রাধিকা। এই কথাটা কী ওকে গ্রাস করছে? নাকি প্রথম প্রেমের মহিমান্বিত শক্তিই আজ ওর এক একটি নার্ভকে শিথিল করে দিচ্ছে।

সহসা সুলতান অনুভব করে, ওর হাতের উপর উষ্ণ পানির ফোঁটা। চোখ তুলে দেখে, সামনে উপবিষ্ট নারীমূর্তির করজোরে প্রার্থনার আসন। চোখ গলিয়ে নামছে টলটলিয়ে আষাঢ়ের ঢল। সুলতান দীর্ঘ দশ বছর পর এই প্রথম গুলশানের চোখে চোখ রাখে। বলে, বিয়ে'র ভাগ্য আজও আমার কপালে জোটেনি। জুটবে কিনা তাও জানি না। তবে গত সপ্তাহে মা'কে কথা দিয়েছি, মা যথারীতি কয়েক গ্রাম জুড়ে বউ খোঁজাখুজি শুরু করেছে। উত্তর পেলে তো? এবার মেহেরবাণী করে হাতদুটো নামাও। ক্ষমা আমি তখন-ই করেছি, যখন দেখলাম তোমার চোখ দুটোয় হাসিখুশির কৃত্রিম ছাপ থাকলেও, ভেতর থেকে চেপে রাখা কষ্টের আবরণগুলো ঠিকরে বেরুচ্ছে।

গুলশান শাড়ির আঁচল ঠিক করে নিয়ে বলে, সত্যিই সুলতান তোমার, শুধু তোমার রাধিকা হাওয়ার জীবন আমার আজ সার্থক হয়েছে।

তাহলে বলো, নতুন পথ না কি যেন বলছিলে?

হ্যাঁ সুলতান। আমার আত্মবিশ্বাস আমাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছে। যে পথ শুধুই আলো দেবে। শিক্ষার আলো। ওর কাছ থেকে ফিরে এসে কিছু একটা নিয়ে ভাবতাম। অনেক প্রচেষ্টার পর দক্ষিণ কৃষ্ণপুরের অতি সাধারণ পরিবারের সন্তানদের জন্য আমি একটা স্কুল খুলেছি। যথারীতি ক্লাশও শুরু হয়েছে। তবু এ শূন্যতা কিসের জন্য, কার জন্য, আজও বুঝে উঠতে পারি না।

গুলশানের কথা বলার সময় ওর চোয়ালের তিলটা ওঠা-নামা করে খেলছিল। সুলতান এই দৃশ্যটা আজ অনেক বছর পর প্রাণভরে এক ঝলক দেখে নিল। গুলশানের কথা শেষ হতেই বলে, আমি কথা দিলাম, তোমর স্কুলের পাশে আমি আমরণ থাকবো।

গুলশানারা ওরফে কৃষ্ণপুরের রাধিকা খুশিতে আবেগাপ্লুত হয়ে সত্যি-ই বলে সুলতানের বলিষ্ঠ বাহুজোড়া জড়িয়ে ধরে। ঝাঁপ দিয়ে সামনের বিশাল দেহের মানুষটার বুকের মাঝে পুকুর পাড়ের হিজল তলের নিঝুম ছায়া খুঁজে ফেরে।

দশ বছর আগের রাধিকা সুলতানের কানে কানে চুপি চুপি বলে, এই, মা'কে বলে দিও—মা যেন আর এ পাড়া ও পাড়া, কষ্ট করে বউ না খুঁজে।

www.pathagar.com

ন্যাপথলিনের বল

খসরুর ভাসা ভাসা চোখ বিকেলের জানালায় স্থির। তেমনি স্থির ওর দেহটা। কম্পিউটার চালু রেখেই তাকিয়ে আছে। সামনের বড় রাস্তা পেরিয়ে চোখ যায় পুকুর ঘেঁষা নারকেলগাছের মাথায়। পুকুরে বাঁশ দিয়ে বাঁধানো ঘাটলা। মেথর-মেথরানীরা গোসল করে আপন মনে। সুগন্ধি সাবানে গা ডলে, মুখ কচলায়। সহসা কানে আসে কাঁচের চুড়ির শব্দ। সেই সাথে সুরেলা কণ্ঠস্বর।

বাইরে কী দেখছেন অমন কার?

আফসানার কথায় জানালা থেকে চোখ দুটো সরিয়ে নেয় খসরু। বিহবল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। জানলা দিয়ে পড়তি বেলার আলো মেয়েটির কালো চুলে ঝিলিক মারে। টেবিলের পাশের সোনালি স্ট্যান্ডে ফুটে আছে টকটকে লাল গোলাপ। বিকেলের সিঁদুরে আলো আর ফুটে থাকা গোলাপের আভা মিশে মেয়েটার চোয়ালের এক পাশে বর্ণ ধরায়। খসখসে চুলের মাঝেও কেমন উদ্ভাসিত চেহারা। কম্পজ করার সময় দুলে উঠছে কানের ঝুলন্ত রিঙ। কি বোডে দ্রুত চলমান ধোয়া মণ্ডরডালের মতো ফর্সা দুটো হাত। ঘন-গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মনিটরের দিকে।

এই মেয়েটি দু মাস ধরে একই নিয়মে প্রতিদিন আসে। সোজা এসে বসে খসরুর পাশের কম্পিউটারে। জয়েন্ট করেছে বড় সাহেবের পার্সোনাল অপারেটর হিসেবে। মেয়েটি আসার পর থেকে স্বস্তি নেই খসরুর। কম্পিউটারের অনেক কিছুই মেয়েটা জানেনা। মাঝে-মধ্যেই জিগ্-গেস করে, এটা কি হবে, ওটা কোথায় থাকে, ফন্ডটা-সেডটা কিভাবে বসাতে হবে, আরও কত কী। খসরু বিরক্ত হোলেও ওর সঙ্গটা বেশ

www.pathagar.com

ভালো লাগে। এই ভালোলাগা আগ্নেয়গিরির জ্বালা মুখ থেকেও, বেরেয়ে আসে ভীতি সঞ্চারিত লাভা। ফুটেওঠে মুখের চামড়ায় হতাশার আবরণ।

প্রথম দিন বড় সাহেব এসে পরিচয় করিয়ে দেন, এ হচ্ছে আফসানা। এখন থেকে আমার পার্সোনাল কম্পোজগুলো ও-ই করবে। আর ও হচ্ছে খসরু। কম্পিউটারের উপর বেশ উচ্চতম ডিগ্রী নিয়ে এসেছে। বড় সাহেব কাঁচঘেরা কামরায় ফিরে যেতেই খসরু বিধ্বস্ত চেহারায় তাকিয়ে থাকে। মেয়েটির দৃষ্টিও অনুরূপ। খসরুর মুখে বিস্ময়ের ছায়া! জগন্নাথ কলেজে তখন চলছে খসরুর ফাইনাল পরীক্ষা। পরীক্ষার তৃতীয় দিন পাশাপাশি সিট হওয়ায় আফসানার সঙ্গে ওর প্রথম পরিচয়। পরীক্ষা আরাম্ভ হয়েছে সবেমাত্র। এর কিছুক্ষণ পরেই দায়ীত্বরত ম্যাডাম এসে আফসানার খাতার তলা থেকে নকলরত কাগজটি ছিনিয়ে নেয়। পাসে বসা খসরুর কাঁধে হাত রেখে আফসানা বলে, এই . . .। খসরু তবু লিখেই যাচ্ছে। আবার বলে, এই তিন নম্বর প্রশ্নটা তোমার কাছে আছে?

খসরু লিখতে লিখতে রাগ করে বলে, না।

আফসানা পুণরায় বলে, থাকেতো দাওনা একটা প্রশ্ন . . .। খসরু এবার চড়া গলায় মুখ ঘুরিয়ে বরে, শুনুন, আমি নকল করি না। এটা পরীক্ষা হল, অতএব . . .

আফসানা এবার খসরুর চোখের সামনেই একটি তেলেসমাতি খেল দেখিয়ে দিলো। কামিজের প্রান্ত তুলে নাভির কাছ থেকে বার করলো এক বান্ডিল নোট বই-এর ছোট পাতা। এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখে খসরুর শান্ত চোখে রক্ত ঝিলিক দিয়ে উঠে।

পরের দিন পরীক্ষা আরাম্ভ হবার পাঁচ মিনিট পূর্বে ম্যাডাম দাঁড়িয়ে থেকে প্রত্যেকের বড়ি সার্চ করে। আজও আফসানার শরীর থেকে বার হলো পুরো একটা মোটা বই-এর সমান কাগজ। গালে হাতে দিয়ে বসে থাকে দীর্ঘক্ষণ। হঠাৎ বিষণ্নতার ভেতর একটা বুদ্ধি খেলে গেল। ম্যাডাম কিছুটা দূরে সরতেই খসরুর কাঁধে থুতনী ছুঁইয়ে খুব মোলয়েম সুরে বলে, এই যে, শুনুন। আমাকে একটু সাহায্য করুন না। আমার না সবগুলো নিয়ে গেছে।

মুখস্ত লিখুন।

কি যে বলেন না। একবার নকল আরম্ভ হলে মুখস্ত আর মনে থাকে? প্লিজ আপনার খাতাটা একটু দেখান না।

খসরু নিজের ক্ষতির কথা খেয়াল করে ওর সাথে আর ত্যামন উচ্চ-বাচ্চ করেনি। একটা করে লুজ সিট উদোম রেখেই লিখে যায়। ম্যাডামের তীর-চক্ষু ফাঁকি দিয়ে যতোটুকু পারা যায়—শেষ পর্যন্ত ওর খাতা দেখেই পরীক্ষা দেয় আফসানা।

এক সময় ক্ষীপ্রতা থেকে দুজনার মধ্যে সৃষ্টি হয় বন্ধুত্ব। আফসানার দৃষ্টি-নন্দন চেহারা সব সময় ওকে কাছে টানে। প্রতিদিন ওরা কলেজে আসে পরীক্ষা আরাম্ভ হবার ঠিক এক থেকে সোয়া ঘন্টা আগে। রুম খোলার আগ পর্যন্ত মেহগনী ছায়ায় বসে গল্প করে।

www.pathagar.com

ক্রমশ বাড়তে থাকে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা। বিশ-পঁচিশ দিনেই হাত ধরাধরি থেকে সম্পর্ক গেছে ঠোঁট পর্যন্ত।

আজ পরীক্ষার শেষ দিন। ছাত্ররা হৈ-হুল্লোড় করে বেরুচ্ছে হল থেকে। খসরুর চোখ নিচে এসে আফসানাকে খোঁজে। যে যায়গায় প্রতিদিন ওরা এসে দাঁড়াতো, সেখানটায় এসেও কিছুক্ষণ ডানে-বামে তাকায় মন খারাপের চোখে। শেষে দেখতে পায় সামনের জটঝোলা বিশাল বটগাছের নিচে। ওর নাম ধরে ডাকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। কিন্তু একি! উদ্‌ভ্রান্তের মতো চোখ দুটো ছানাবড়া। জিন্সের সার্ট-প্যান্ড পরা দীর্ঘদেহি এক যুবকের সাথে হোন্ডায় পাছা দাবিয়ে বসে আছে। 'আফসানা' বলে প্রচন্ড জোরে ডাকতে গিয়েও ভেতর থেকে বাধাগ্রস্থ হয় আহত পানকৌড়ির মতো!

আফসানার গোলাপী ঠোঁটে খিলখিল হাসির ঢেউ। যাওয়ার সময় শুধু হাত নেড়ে বলে– আসি।

বিধ্বস্ত চেহারায় দাঁড়িয়ে থাকে খসরু। মুখের চামড়ায় হতাশার ছাপ! ক্ষীপ্র গতির মটর সাইকেলটা যেন ওর বুকের কলকব্জাগুলো থেতলে দিয়ে মিলিয়ে গেলো সামনের জন সমুদ্রে।

সেই মেয়েটিই আজ কাকতালিও ভাবে এক-ই অফিসে পাশাপাশি কর্মরত। কি বোডের কভার পুরতে পুরতে আফসানা খসরুর দিকে তাকায়। পাঁচটা বাজার আগেই বলে, আমার কাজ ওকে। তোমার হেলো।

হোলো মানে? অফিসতো আরও এক ঘন্টা বাকী।

বসকে এসেই বলেছি। একটু বেরুতে হবে।

জরুরী থাকলে তুমি যাও।

যাবো। তবে তোমাকেও যেতে হবে আমার সঙ্গে।

তার মানে?

ও সব মানে টানে বাদ দাও তো, তোমার সঙ্গে কাজ আছে জরুরী।

রিকশা এসে থামে পদ্মার তীরঘেঁষা কালো রাস্তায়। ঘনো বাবলা-বীথি ছায়া মাড়িয়ে পাশাপাশি দু'জন। নদীর বুক থেকে চোখ ফেরায় আফসানা। বলে, তোমাকে কিছু কথা বলবো। যদি শোনার মতো ধৈর্য এবং সময় তোমার থাকে।

তাই বলে এখানে?

হ্যাঁ। আড়াই বছর আগের অব্যাক্ত যন্ত্রনার ইতিহাস বলবার, এটাই একমাত্র নিরাপদ জায়গা।

দুটো গাঙচিল মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায়। সামনে দিয়ে দমকা বাতাস ছুঁয়ে যায় ওদের শরীর। আফসানা আস্তে করে বুকের সাথে আঁচলটা সেটে দিয়ে বলে, গত আড়াই বছর আগে তোমর সাথে দেখা হয় জগন্নাথে। যে ছেলেটিকে আমার সঙ্গে মটর সাইকেলে দেখেছিলে, ও তখন আমাদের বিত্তহীন পরিবারের হবু জামাই। তুমিই

www.pathagar.com

বলেছিলে, সুন্দরী ছাড়াও আমার চোখে অন্য রকম এক আকর্ষণ শক্তি আছে—যা দেখে পুরুষ মাত্রই আকৃষ্ট হয়। সেও ঐ চোখদুটো দেখে আমাকে ভীষণ ভাবে পছন্দ করে। কিন্তু বাবা-মা'কে শর্ত জুড়ে দেয়, বিএ পাশটা যেন হওয়া চাই। কিন্তু টিউমারের কারণে লেখা-পড়া নিয়মিত করার মতো শারিরীক ও মানুষিক অবস্থা আমার ছিলো না। পরিস্থিতির স্বীকার একজন নারী, প্রস্তুতি ছাড়ায় একজন পরুষের সহযোগীতায় পরীক্ষা দেয়। তোমার সঙ্গে প্রেমের ছলনা করে তোমারই সাহায্যে পাশ করি।

বিয়ের পর ওর মিটে যায় বিএ পাশ বউ-এর সাধ। ভয়ে আতঙ্কে দিনরাত মন থাকে শুধু উঁচাটান। কিছু দিন যেতেই জানা যায়, ও একটা মস্ত বড় স্মাগলার। দিনের পর দিন পড়ে থাকে—ঢাকা আর সীমান্তের ঘাটে। সঙ্গ দেবার মতো সময় তার নেই বললেই চলে। দিন দিন ওর চোরাকারবারী নেটওর্য়াক যেমন বিস্তৃতি লাভ করে—পুলিশি হুলিয়াও তেমনি ছড়িয়ে পড়ে। ছ' সাত মাস আগে চ্যালাচামুন্ডাসহ ওকে ধরে নিয়ে যায় পুলিশে। বিতৃষ্ণায় অতৃপ্ত মন নিয়ে ফিরে আসি বাবা-মা'য়ের শহরতলীতে। এর পরের টুকু নিশ্চয় আর বলতে হবে না? এখন বলো, পারবেনা, চিরদিনের মতো আমাকে ক্ষমা করতে?

নীরব মুখে বসে থাকে খসরু। মনের সমস্ত অন্ধকার আর নিস্তব্ধতা ভাঙচুর করে বলতে ইচ্ছে করে, আমি এখনও তোমাকে আগের মতোই জানি। মনে মনে বলে, জীবনের একটা বিশেষ সময়ে শুধু ভালোবাসলেই সবকিছু হয়না। চাই ভালোবাসার পূর্ণতা। চাতক যেখানে চেয়ে থাকে, নদী যেখানে মিলতে চায়, আর জীবন যেখানে পূর্ণতার রসে সার্থক হয়।

খোসরুর নীরবতা দেখে আফসানা বলে, তুমি কী পারোনা আড়াই বছর আগের সেই হাত দুটো বাড়িয়ে দিতে?

মনের অব্যাক্ত কথাগুলো বেমালুম চেপে গিয়ে খসরু বলে, এখন আর তা হয় না। জীবনের চেয়ে জীবনচক্র আরও জটিল। যা ধাপে ধাপে মানুষের পরিবর্তিত সিদ্ধান্তের সাথে কুলোয়ে উঠতে পারে না। তাছাড়া তোমার ভিন্ন একটা জগৎ আছে। স্বামী-সংসার সেখানে বিদ্যমান।

গোল্লায় যাক সে সব। তুমিতো জানো, সব কিছুর মোহ ছিন্ন করেই আমি পা তুলেছি। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে মিটমিটে হলেও, অদৃশ্য বন্ধন এখনও তোমার ছিন্ন হয়ে যায়নি।

ওসব আলগা বন্ধন নারীর নিঃসঙ্গ জীবনে কোনো কাজে লাগে না। এই জটিলতার কুয়ো থেকে তোমার সাহসী হাতে একটি প্রাণকে উদ্ধার করতে পারো না?

আবেগে ভেঙে পড়ে আফসানা। দু'ফোঁটা পানি হয়তো ওর চোখের পাড় ভিজিয়ে দিয়েছে। খসরু ওর ইমোশনাল অবস্থা পরিমাপ করে একটি হাত বাড়িয়ে দেয় সামনের তৃষ্ণার্ত হাতে। সিঁদূরাসক্ত বিশাল সূর্যটা ক্রমশ তলিয়ে যায় পদ্মা-পাড়ের ঘন-সবুজের আড়ালে।

www.pathagar.com

কাজের ফাঁকে সহসা বেজে ওঠে পাশে রাখা প্যারালাল সেট। আফসানা রিসিভার তুলে এক মিনিট বাদেই রেখে দেয়। কম্পিউটার খোলা রেখেই খসরুর দিকে মুখ করে বলে, বড় স্যার জরুরী ডেকেছেন। খেয়াল কোরো, এক্ষুণি আসছি।

আফসানার ফিরে আসতে বেশ সময় লাগে। জানলার গ্লাসে খেলাকরে দুপুরের কড়া রোদ। একটি চড়ুইপাখি ছোটাছুটি করে ঘরের ভেতর। সহসা বৈদ্যুতিক পাখায় বাড়ি খেয়ে ছিটকে পড়ে মনিটরের ওপর। বেশ কিছু পালক পাখার বাতাসে উড়তে থাকে ঘরময়। আধমরা পাখিটার দিকে তাকিয়ে থাকে খসরু। ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরে ঢোকে আফসানা। শ্রাবণের কালো মেঘের মতো মুখ করে একেবারে খসরুর পাশে এসে দাঁড়ায়। আধো মুখে বলে, খসরু . . . এইবারের মতো আমাকে ক্ষমা করতে পারোনা? আমাকে নিতে এসেছে। জেল থেকে ছাড়া পেয়েই ছুটে এসেছে আমার কাছে। স্যারের সমানে ভুল স্বীকার করেছে। শুধু আর একটি বারের মতো আমায় ক্ষমা করো!

নিরুত্তাপ খসরু ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, মানুষ যা চায় তার কিছুটা হয়তো পায়, কিন্তু যা চায় না তার সম্পূর্ণটা পেয়ে কী লাভ। তাছাড়া নদীতে যার বসোবাস-শিশিরের কনা তার কি-ই বা করতে পারে, বলো?

আজ কেন যেন খসরুর নিজেকে ন্যাপথলিনের বলের মতো ভাবতে ইচ্ছে করছে। অতি সযত্নে ন্যাপথলিন রাখা হয় মোলায়েম কাপড়ের ভাঁজে। নিজেকে নিঃশেষ করার মধ্য দিয়ে কীট-পতঙ্গের আক্রমন থেকে রক্ষা করে অন্যের সম্পদ। কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে সুগন্ধি ছড়ালেও শত চেষ্টায় ধরে রাখতে পারেনা নিজের অস্তিত্ব। একটু একটু করে ক্ষয়ে যেতে যেতে মিশে যায় ভাসন্ত হাওয়ার সাথে।

খসরুর মনের ভেতর একটা চাপা গোঙানি ক্রমশ বেজেই চলেছে। বর্ষায় ধসে পড়া চাপ যেন মহানন্দায় না পড়ে আছড়ে পড়ছে ওর বুকের জমিনে। যা কোনো কালেই সে কাউকে বলতে পারবে না, আবার অস্ত্রপচার করে বের করে ফেলাও সম্ভব না।

www.pathagar.com

মন ও মুখোশ

সেদিনটা থেকে এক সপ্তাহ পার হয় নি। তখন থেকে কচি প্রচণ্ড একটা প্রতিশ্রুতিতে হাঁপাচ্ছে। একে তো কচির বয়সটা কচি, তার ওপর জীবনে প্রথম কাউকে ভালোবাসা। বয়স চৌদ্দ কি পনের। এছাড়া বান্ধবীদের জীবন আর নিজের চারপাশকে নিয়ে ভাবতে ভাবতে মনের অবস্থা থিতু হয়ে আসে। তবে এ এক সপ্তাহে ও একটু একটু করে বুঝতে শিখেছে মনের অজান্তেই মনের আদান-প্রদান এভাবেই বুঝি হয়ে যায়। লম্বা চুলের বিনুনী গাঁথতে গাঁথতে কচি ভাবে, আবার হাসে, আবার ভাবে, যে মানুষটিকে মনের কথা খুলে বলছে, অথচ তাকে আজ পর্যন্ত চোখেই দেখেনি।

তবে এটা কী ভাবে সম্ভব?

হ্যাঁ সম্ভব। প্রযুক্তির উৎকর্ষ মানুষের জীবনকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। ঐ যে, পাশের ঘর থেকে মুঠোফোনে রিঙটোনের শব্দটা শোনা যাচ্ছে। কচি ধীর পায়ে উঠে গিয়ে ফোনটা রিসিভ করে। কথা না বলে চুপচাপ নিজের পড়ার টেবিলে বসে। এবার কেউ শুনতে না পায় এমন ভঙ্গিতে নীচুস্বরে বলে, হ্যালো....।

কে কচি? ডা: সাজিদ বললো।

হ্যাঁ। আপনি ভালো আছেন?

আছি, তবে তুমি এতো আস্তে কথা বলছো কেন?

ওটাই তো মরণ, পুরুষ মানুষ বুঝবেন না।

কেন কোনো সমস্যা?

সমস্যা তো মেয়েদের থাকবেই, ওসব বাদ দিন। শুনুন, পাশের ঘরে ভাইয়া শুয়ে আছে।

www.pathagar.com

ও, তাই বলো। আমি ভাবছি কি না কি হয়ে গেল।

কচি খুব নীচু গলায় বলে, এখন কেটে দিন, রাতে কল দিয়েন। আজ রাতে খুব সুন্দর জ্যোৎস্না উঠবে কেমন? কচি আস্তে করে মুঠোফোনের লাইনটা কেটে দিল। বই-এর ফাঁকে তর্জনী আঙুল, কিন্তু পড়াতে মোটেই মন বসছিল না। ভেতর থেকে কেমন যেন একটা অজানা অস্থিরতা বেরিয়ে আসতে চাইছে। মুখ-চোখের পশমে চটপটে ভাব স্পষ্ট।

কচি হাতের বইটি টেবিলে রেখে অতীত স্মৃতি খুঁজে ফেরার চেষ্টা করে। সেই প্রথম দিন। অচেনা একটি নাম্বার থেকে কল আসে। নাম্বার না চিনলেও হঠাৎ ফোনটা রিসিভ করে। শুরু হয় কথার আদান-প্রদান। মাঝে মাঝে গা শিউরে উঠে! এভাবে হাটি হাটি পা-পা করে ঠিকানাবিহীন বন্ধুত্বের পথচলা শুরু। এখন আর কথার মাঝে কোনো জড়তা নেই। সব চেয়ে ভালো লাগে, ছেলেটি ভারি সুন্দর করে কথা বলে। বয়স ও বেশী বললেও কচির কাছে বেশী বলে মনে হয় না। মাঝে মাঝে সুযোগ পেলেই ওর অন্যান্য টিন-এ জার বান্ধবীদের সঙ্গে এ বিষয়ে শেয়ার করে। ঠিক সেই সময়টিতে মনের মধ্যে অন্য রকম একটা আনন্দের অস্থিরতা বিরাজ করে। যা বিদ্যুতের মতো মনের মধ্যে শিহরণ জাগায়! প্রথম দিন ডাঃ সাজিদ আরমান বলেছিল, সরি, রঙ নাম্বার। কিন্তু পরের দিন থেকেই রঙ নাম্বার হয়ে গেল সঠিক নাম্বার।

আজ এ চৈত্রের অলস দুপুর মোটেই পার হতে চাইছে না। কচির শরীর খারাপ তাই স্কুলে যায় নি। ভাই অফিসে, ভাবী স্কুলে। হঠাৎ ভাবল, ঐ নাম্বারটাতে মিসকল দেই। কিন্তু পরক্ষণেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। ফোনতো বাড়িতেই নেই। দু'টো ফোন দু'টোই ভাই-ভাবী নিয়ে গেছে। ও অবশ্য বলেছিল, স্ব-শরীরে সাক্ষাৎ হলে একটি ফোন-ই কিনে দেবে। কিন্তু এখন যে মন মোটেই মানতে চাইছে না। কি সাংঘাতিক কথা? এমনটা হচ্ছে কেন?

হবে না? বয়সটা যে সম্পূর্ণ অন্য রকম। স্কুলের কমনরুমে কিংবা পাড়ার ঐ নিমগাছ তলে পাঁচ বান্ধবী যখন এক হয় তখন তো কথার খৈ ফুটে। কোন্ ছেলেটা স্মার্ট, কি বিশাল বুকের ছাতি, পেশী কতো চওড়া, কোঁকড়ানো চুল কি সুন্দর, ভারতের নায়কের মতো দুপাশে লম্বা চীপ, কেউ স্বতস্ফূর্ত কথা বলে, আবার কেউ চোরের মতো আস্তে কথা বলার চেষ্টা করে। কে নতুন মোবাইল ফোন কিনেছে। কার চাচা বিদেশ থেকে সেট পাঠিয়েছে, কার কালার মনিটর, কার ডিসপ্লে বড়, এছাড়া মোবাইল ফোনে ক্যামেরা, ভিডিও, এমপি থ্রী এমপি ফোর ইত্যাদি ছাড়া এমন বয়েসের মেয়েদের আসর জমেই না।

দুপুর বেলা ভাবী স্কুল থেকে ফিরলেই ফোনটা কচির দখলে চলে যায়। সন্ধ্যায় ভাই বাড়ি এলে কেউ খেয়াল না করলে ফোনটা রাত্রে ওর কাছেই রেখে দেয়। ভাই ঘুম থেকে ওঠার আগেই পুণরায় ফোনটা টেবিলে রেখে আসে।

www.pathagar.com

একদিন শুক্রবার। ছুটির দিন। জাকিয়া বানু পাশ কুঠরিতে বাচ্চাদের খাওয়া-দাওয়া নিয়ে ব্যস্ত। হঠাৎ ঘরে মোবাইলের রিঙটোন বেজে ওঠে। জাকিয়া বানু গলা চড়িয়ে বলে, কচি ফোনটা নিয়ে আয় তো।

কিন্তু সময় পাঁচ মিনিট মতো পার হলো, তবু কচির কোনো খবর নেই। প্রথমে জাকিয়া বানু অতোটা খেয়াল করেন নি, পরে ছেলে-মেয়ে দুটোকে পানি খাইয়ে মনে হলো, ঘরের মধ্যে কে যেন কথা বলছে। এর-ই মাঝে দরজার কাছে ভাবীর পায়ের শব্দ শুনে লাইনটা কেটে দেয় কচি। তটস্থ অবস্থায় ভাবীকে দেখে হকচকিয়ে ওঠে।

কে ফোন করেছিল রে?

কেউ না ভাবী।

তুই যে এখনই কথা বলছিলি?

ও রঙ নাম্বার।

তোকে আমি ফোন নিয়ে আসতে বললাম, আর তুই ৫/৭ মিনিট ধরে কথা বলছিস; আবার এখন আমাকে দেখে বলছিস রঙ নাম্বার?

কচি ইতস্তত করে বলে, না, মানে মা-নে।

এবার জাকিয়া বানু গলা চড়িয়ে বলে, মানে মানে কী? তার মানে সম্পূর্ণ মিথ্যে কথাটা বলতে গিয়ে আটকে যাচ্ছে, এইতো?

তা না ভাবী। মানে, তুমিতো জানো, আজকালকার ছেলেগুলো খুব ন্যাকামু জানে। ফোনে মেয়েদের কণ্ঠ শুনলে আর ছাড়তে চায় না। ইনিয়ে-বিনিয়ে না-না-ন কথা। তা ছাড়া আমাকে তো তুমি জানো।

জাকিয়া বানু এবার ফুঁসে উঠে, হ্যাঁ, তোমাকে তো আমি জানবোই। তুমি আমার সুযোগ্য ননদীনি, তোমাকে জানবো না। এর আগেও আমি তোমাকে পাখির বাচ্চার মতো চি-চি গলায় কয়েক বার কথা বলতে শুনেছি। আমার এক কৌটা বাচ্চা মেয়েটা পর্যন্ত এসে বলে, আম্মু তুমি জানো, ফুপি তো রোজ চুপ করে করে কার সঙ্গে কথা বলে।

ও তোমাকে মিথ্যে বলেছে ভাবী।

চুপ কর হারামজাদী। তোর জন্য আমার ছেলেমেয়েগুলো পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যাবে।

তাই বলে ভাবী, তুমি মুখ খারাপ করবে ?

মুখতো আমি খারাপ করতে চাইনি। তোকে আমি অনেকবার ঐ ছেলেটার সঙ্গে মোবাইলে কথা বলতে দেখেছি। তোর বান্ধবী রোকেয়ার মাধ্যমে তোকে ইনডাইরেকট বলার চেষ্টাও করেছি, তারপরও তুই মিথ্যে বলছিস। তোকে কি আমি পুজো দেবো?

কচির কণ্ঠ দিয়ে অনুনয় ঝরে পড়ে, দেখ ভাবী, কপাল দোষে মা মারা গেল। আর তাই তোমার সংসারে পড়ে আছি। দু মুঠো খাই–তেমনি সাত গুণ কাজ টানি। দোহাই তোমার, মুখে যা আসে তাই বলো না।

www.pathagar.com

জাকিয়া বানু ঝুলে পড়া আঁচলের প্রান্ত তুলে নিয়ে বলে, লজ্জা থাকলে কোনো মেয়ে এ বয়সে এমন কাজ করে? এই, তোর কি এমন বয়েস হয়েছে বল? বছরখানেক হলো ওড়না পরা ধরেছিস। একদিক ঢাকলে আরেক দিক উদোম হয়। আজ পর্যন্ত অভ্যাস-ই হলো না। বারবার বুক ঢাকার কথা মনে করিয়ে দিতে হয়। আর শোন, রিক্তা মেয়েটা খুব খারাপ, ওদের বাড়ি ককখোনো যাবি না। অমন বান্ধবী নাইবা থাকলো।
অনেক বকেছে। ধীরে ধীরে জাকিয়া বানুর রাগ কমে আসে। সব শেষে বলে, এবার যদি মোবাইলে কথা বলতে দেখি, তোর ভাইকে সাফ সাফ জানিয়ে দেব হ্যাঁ।

দুপুর বেলা। জাকিয়া বানু পুকুরে গেছে। মুঠোফোন অনেকক্ষণ ধরে টেবিলে বাজছে। বাজতে বাজতে ক্লান্ত হয়ে থেমে যায়। আবার বাজতে থাকে। টেবিলের ধারেই দাঁড়িয়ে আছে কচি। ফোনটা ধরার জন্যে অস্থির হয়ে ওঠে মন। কিন্তু ভাবীর দেয়া অদৃশ্য ব্যারিকেড বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আজকাল ভাস্তে-ভাস্তি দুটোও খুব পাজি হয়েছে। ফোন ধরলেই দেখতে পেলে ওর মা'কে বলে দেয়। ফোনটা থেমে গিয়ে তৃতীয় বারের মতো পুণরায় বেজে চলেছে। কচি মনে মনে ভাবলো, ধরবে না। আবার ভাবলো, ভাবী তো পুকুরে কয়েকটা কাপড় কেচে তবে না ঘরে ফিরবে। পাঁচ-ছয় ভাবতে ভাবতে মুঠোফোনটা সহসা হাতে তুলে নেয়। সেই নাম্বার। যে নাম্বারটি দেখলেই হৃদকম্পন বেড়ে যায়। সমস্ত লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে ফোনটা রিসিভ করে। হ্যালো.....।

অপর প্রান্ত থেকে বলে, কি ব্যাপার, ফোন ধরতে এতো সময় লাগে?

শোন তুমি কি আমাকে বেঁচে থাকতে দেবে? তোমাকে বারবার বলেছি না, আমি মিসকল দিলে তুমি তখন কল করবে। এদিকে ভাবীর কাছে আমার প্রাণ যায়-যায় অবস্থা।

শোন সাথী, তা জানি, কিন্তু মন যে মানে না, কি করি বলো? তুমি চলে এসো বগুড়া। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না।

ওসব ন্যাকামু ছাড়, রিক্তার নাম্বার থেকে বিকেলে কল দেব– তখন কথা বোলো কেমন? কেমন বলে–ফোনের লাইনটা কেটে ঘাড় ঘুরাতেই কচি দেখতে পায়, পেছনে দাঁড়িয়ে আছে জাকিয়া বানু, ভূত দেখার মতো চমকে উঠে মাথা নীচু করে। জাকিয়া বানু ভেজা কাপড়েই মুখ খুললেন, এই, তোর লজ্জা নেই; আবার কথা বলছিস মোবাইলে। এখানে পিরিতের কথা বলে শেষ হলো না আবার রিক্তাদের বাড়ি? জাকিয়া বানু ননদীনির চুলে হাত দিয়ে ছিল, আবার কি মনে করে ছেড়ে দিয়ে বলে, দাঁড়া। তোর যখন লজ্জা নেই আজ তোর ভাইকে না বলে দম নিচ্ছি না। এই মাগী তোর মতো বয়স কী আমার ছিল না? তোদের মতো কুরকুরিয়্যা ব্যাড়ায় নি। এখনকার ছুঁড়িয়্যা খালি মরদ দেখলেই ছুলবুলিয়ে ব্যাড়ায়। খাচ্চরনির দল কোথাকার। দাঁড়া, তুই কতখানি পেকেছিস তাই দেখছি। জাকিয়া বানু রেগে গেলে আঞ্চলিক ভাষা এমনিতেই

www.pathagar.com

চলে আসে। আজ হয়তো এতোটা রাগতো না। যখনি শুনেছে ঐ বাজে মেয়েটা–রিক্তার কথা, তখনি ওর চাঁদি গরম হয়ে তেতে উঠেছে।

এমনি ভাবে এক সপ্তাহ পার হলো। এরপর অতি সন্তর্পনে পাড়াতে এবং স্কুলে দু'জন গোয়েন্দা লাগিয়ে দিল জাকিয়া বানু। এক সপ্তাহে গোয়েন্দার সফল রেজাল্ট ওর কানে এলো। টিফিন না খেয়ে ঐ টাকা দিয়ে স্কুলের পাশে বসা দোকান থেকে প্রতিদিন মুঠোফোনে কথা বলে।

রাতে পরীক্ষার খাতা নিয়ে বসলো জাকিয়া বানু। কিন্তু খাতা দেখায় মন বসাতে পারছে না। চিন্তার রেখাগুলো ছড়িয়ে পড়ে চেহারাময়! বাড়িতে কথা বলা মোটামুটি সেফ করলো, পাড়াতে রিক্তাদের বাড়িতে যাওয়াটাও এক প্রকার বন্ধ– তারপরও ওর মোবাইলের নেশাটা মাথা থেকে নামানো গেল না। জাকিয়া বানুর চিন্তিত মুখের ছায়া দেখে জামান সাহেব সন্তর্পনে কাঁধে হাত রাখতেই সামান্য কেঁপে উঠলো। ও তুমি!

কেন অন্য কাউকে ভাবছিলে না কি?

না, অন্যমনস্ক ছিলাম কি না।

সত্যি করে বলো তো, অন্যমনস্ক থাকলে কেউ খাত দেখে ? জাকিয়া বানু স্বামীকে উত্তর না দিয়ে কিছু সময় একা একা ভাবলো। কি করা যায়। অন্য কোনো ভাবী হলে, কখন কানে তুলে দিতো স্বামীর। কিন্তু জাকিয়া বানু তা করেননি। আর পাঁচজন ভাবীর চাইতে ও একটু আলাদা। ননদ হলেও কচিকে ছোট বোনের মতই ভালোবাসে। অনেক ভেবে চিন্তে মন স্থির করলো, আজ স্বামীকে সে সবকিছু খুলেই বলবে। নইলে এর চেয়ে বেশী কিছু ঘটলে ওর সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না।

জাকিয়া বানু টেবিল থেকে মাথা তোলে ওপরে। সহসা জামান সাহেবের হাতটা চেপে ধরে বলে, ওগো, অনেক চেষ্টা করেছি–আমি আর সইতে পারছি না। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।

কি হয়েছে বলবে তো? জাকিয়া বানু সব ঘটনা খুলে বলে স্বামীকে। জামান সাহেব সামনে উপবিষ্ট নারী শরীরটির কাঁধে হাত বুলিয়ে বলে, আগে বলনি কেন?

সব কথায় কি পুরুষ মানুষের কানে দিতে আছে? চেষ্টা করেছিলাম বড় বোনের মতো সামলে নেবো। কিন্তু পারলাম কই? সেদিন পেপারে দেখলাম, এভাবে মুঠোফোনে কথা বলতে বলতে একটি ওর বয়সি মেয়ে নিখোঁজ হয়ে গেছে। আমার শুধু ভয় হচ্ছে যদি কিছু হয়ে যায়?

এরপর তিনটি দিন কোনো মতে পার হলো। তারপর কচির অবস্থা "যেমন ছিলে" অর্থাৎ আগের মতোই। বাড়িতে মেহমান এলে তার মোবাইল থেকে কাঙ্খিত নাম্বারে কথা বলে।

কচির অবস্থা দৃশ্যত মনে হয়–হেরোইন-এর চাইতেও ওর বড় নেশা এই মোবাইল। এর মাঝেই একদিন জাকিয়া বানু দেখতে পেলো, গভীর রাতে ওর মোবাইল থেকেই

www.pathagar.com

কচি চিঁ চিঁ কণ্ঠস্বরে পাখির বাচ্চার মতো অতি সন্তর্পণে কথা বলছে। জাকিয়া বানু মনে মনে ভাবলো, আজকালকার মেয়েগুলোর লজ্জা বলে কি কিছুই নেই! ওর ভাই সেদিন-ই শাঁসালো। তারপরও বে-হায়ার মতো কেউ ভুলে যায়? সে নিজে এখনও ননদের সামনে নিজের স্বামীর পাশে ঘন হয়ে বসতে লজ্জা পায়। আর পর পুরুষ, যাকে কখনও চোখেই দেখেনি এমন একজন দুশ্চরিত্র মানুষের সঙ্গে দিনের পর দিন কিভাবে কথা বলে? একটি বারও ভাবে না ছেলেটি যদি অসৎ হয়, লম্পট হয়? নারীর দুর্বল মুহূর্তে মধু চুষে সুযোগ বুঝে উড়াল দেয়– তখন? সেলফোন নামক এই যন্ত্রটির ওপর ওর ভীষণ রাগ হলো। উন্নত দেশের প্রযুক্তি এমন দেশে কেন এলো? সেলফোন থেকে বিপদের সময় উপকার হয় ঠিকই, কিন্তু চোর-বাটপার ছিনতাই- ডাকাতিসহ অশ্লীল ভাষায় মেসেজ পাঠানো শয়তান, জানোয়ার ছোঁড়াগুলোর যন্ত্রণার জ্বালাটাই যেন বা বেশী! ওর মতো মধ্য বয়সের নারীকেও মুখে আনার মতো নয়–এমন ভাষায় কথা বলে। আর তখন লজ্জায় নিজেরই মরে যেতে ইচ্ছে করে।

এই প্রথম ২৪ ঘন্টা পার হতে চলেছে কচি নিখোঁজ!

বাড়িতে নেই। কোনো খবরও নেই। বাড়িতে নেই মানে, তাহলে কি হাওয়া হয়ে গেল? বুঝলে না মশাই। আজকালকার টিন-এজার মেয়েদের মন–শুধুই জ্বালাতন। না হলো না–স্বেচ্ছায় নির্বাসন।

রাতে জাকিয়া বানু জামান সাহেবকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি ওকে কিছু বলেছিলে?

জামান সাহেব উত্তর দিলো, শুধু বলি-ই নি। কয়েক ঘা দিয়েছিও।

ভাই হয়ে ছোট বোনের গায়ে হাত তুলতে পারলে?

জামান সাহেব স্ত্রীর উপর চটে উঠে, লুনাকে নিয়ে আমি যখন হাসপাতালে, তখন তোমাকে আরও টাকা নিয়ে শহরে আসার জন্য রিং করি। আধা ঘন্টা ধরে মোবাইল-এ শুধু 'ইয়ুজ আর বিজি'। শেষ পর্যন্ত নোমান ভাইকে রিঙ দিয়ে টাকা নিয়ে চিকিৎসার কাজ সমাধা করতে হলো। বাড়ি এসে জানলাম, ভর দুপুরে বাড়ির পেছনের কাচমিষ্টি আম গাছের নীচে কার সঙ্গে মোবাইলে কথা বলছে।

জাকিয়া বানু স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে হা হয়ে গেল। আর কোনো কথা যোগালো না।

হঠাৎ জাকিয়া বানুর মোবাইলে কল আসে। কথা শেষ করে স্বামীর দিকে মাথা তুললো, ওঃ যাক বাঁচা গেল। ও বেশীদূর যেতে পারেনি।

যেতে পারেনি মানে?

তোমার খালাতো ভগ্নীপতি বাসেদ বললো, কচি এখন ওর হেফাজতে আছে।

ওখানে কেন?

ও ঠিক-ই বগুড়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়, কিন্তু পুঠিয়া গিয়ে টাকা না থাকায় বাসেদের বাড়িতে উঠে। টাকা চাওয়া, পাশাপাশি ওর হাবভাব মুখচোখের অবস্থা দেখে তোমার

www.pathagar.com

খালাতো বোনের সঙ্গে পরামর্শ করে। সন্দেহ দানা বাঁধলে আমার কাছে রিঙ দেয়। আমি অবশ্য বলেছি, ও যেন বগুড়া যেতে না পারে।
জামান সাহেব অস্থির হয়ে বলে, বাসেদ কি বললো?
ও অবশ্য বললো, কোনো চিন্তা করবেন না ভাবী, রাতটুকু পেরুলে কাল সকালে আমি ওকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবো।

জামান সাহেব অসহায় বৃদ্ধের মতো ফ্যালফ্যাল করে শুকনো দৃষ্টিটা ছুঁড়ে দেয় জাকিয়া বানুর দিকে। যেন বা জীবনের কোনো এক টার্নিং পয়েন্টে চরম ব্যর্থতার শিকার। ভাসা ভাসা দৃষ্টি ছাদের মাকড়সার জালের দিকে নিবদ্ধ। শুধু অস্ফুটে ঠোঁট চিরে বেরোলো, তিনটি ভাইকে বড় করে তুললাম, আর এই এককোণা বোনকে শেষ পর্যন্ত মানুষ করতে পারলাম না?

পরের দিন খুব লজ্জাবনত মাথায় বাসেদের পিছু পিছু ফিরে এলো কচি। জাকিয়া বানু আগে থেকেই স্বামীকে বারণ করে দিলো– যেন কিছু না বলে। এ বয়েসের মেয়েদের মতিগতি একটু অন্য রকম– বলা যায় না কী হতে কী হয়ে যায়।

দেখতে দেখতে পার হলো আরও একটি মাস। বাড়িতে আর কোনো সমস্যা নেই। কচিকে কেউ আর মোবাইলে কারও সঙ্গে কথা বলতে দেখেনি। বাড়িতে ক্রমশ বইতে লাগলো শান্তির নির্মল হিমেল হাওয়া। জাকিয়া বানুও যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। কেননা এমনিতেই সে নানান ঝামেলায় থাকে– স্কুল, সংসার, ছেলে-মেয়ে, তাদের পড়াশুনা, তার উপর মোবাইল সম্পৃক্ত ননদিনীর উটকো ঝামেলা; সব মিলে কয়েকটা মাস মনের ওপর অশান্তির ঝড় বয়ে গেছে। এর আগে যতো ঝামেলাই থাক, রাত দশটার পর স্বামীকে নির্জনে একান্তে কাছে পেত। তখন কথার আর কোনো অন্ত ছিল না। ঘর-সংসার, আত্মীয়, পাড়া-প্রতিবেশী, দেশ-দুনিয়া তারপর পুরোনো দাম্পত্য অম্ল-মধুর স্মৃতিগুলো মন্থন করতো। এক সময় উভয়ের বাহু বন্ধনে ঘুমিয়ে পড়তো।

ইল্লত যায় না ধুলে আর খাসলত যায় না ম'লে।

কেন, হঠাৎ একথা আসলো কেন?

আরে মশাই দাঁড়ান। এতো ব্যস্ত হলে কি চলে ? এক একটা সময়কে মানুষ চিহ্নিত করতো এক একটা নাম দিয়ে। যেমন শিল্প বিপ্লবের যুগ, বিজ্ঞানের যুগ, ইস্পাতের যুগ, বিদ্যুতের যুগ, কম্পিউটারের যুগ অর্থাৎ যখন যে জিনিসটা মানুষের বেশী চোখে লেগেছে, বেশী ব্যবহার হয়েছে– সেটাই মানুষের মন-মস্তিষ্কে দাগ কেটেছে। আর ইদানিং মানুষে কী বলছে জানেন? এই সময়টা, এই সময়টাকে মানুষ বলছে " মোবাইলের যুগ"। এই সময়ে মোবাইল তরুণ সমাজের মাঝে এমন এক সম্মোহনী আকর্ষণের সৃষ্টি করেছে যা অতিক্রম করা তাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

www.pathagar.com

সমস্ত লোকচক্ষুর অগোচরে কচির আবার কথা হয় ডাঃ সাজিদের সঙ্গে। কথা বলে পাশের বাড়ির ভাবীর মুঠোফোন থেকে। ডাঃ সাজিদ বলে, কচি, আগামীকাল আমি রাজশাহী আসছি ব্যবসার কাজে।

তাই নাকি!

হ্যাঁ।

সত্যিই তা হলে তোমাকে আমি দেখতে পাবো? আমাকে দেখে তোমার পছন্দ না হলে ভুলে যাবে নাতো?

আরে না, প্রশ্নই আসে না। আমি তো তোমার সুন্দর কচি মনটাকে ভালোবেসেছি। তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে তো?

হ্যাঁ, তবে শোনো, আগামী কালের পরের দিন, তুমি ঠিকানা মতো আমাদের বাসায় চলে এসো। ঐ দিন বাড়ি ফাঁকা থাকবে, কেমন?

এরপর সাজিদ গুডবাই বলে লাইনটা কেটে দিল। রাতে ভালো ঘুম হলো না কচির । শরীরে কেমন যেন একটা অজানা শিহরণ বয়ে যাচ্ছে। ফাগুনে যেমন সব গাছের সব পাতা নতুন ভাবে গজিয়ে ওঠে– ঠিক তেমনি নতুন একটি আনন্দঘন অনুভূতি কচির মনের ভেতরটা উল্লাসে তোলপাড় করে তুলছে! আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে নদীর অবস্থা যেমন হয়। কিন্তু এই আনন্দের বিষয়টা এই মুহূর্তে ও কার সঙ্গে শেয়ার করবে? এ বাড়ির সকলেই তো ঐ একটি কারণে ওর শত্রু। ঠিক তখনি ওর চোখ চলে গেল ভ্যানিটি ব্যাগের ওপর। পাশের বাড়ির ভাবীর কাছ থেকে সন্ধ্যায় মুটোফোনটি অতি সর্ন্তপণে লুকিয়ে নিয়ে এসেছে। তিন দিনের জন্যে ঐ ভাবীর কাছে ফোনটি ধার নিয়েছে। নিজের ইচ্ছেটাকে অনেক কষ্টে চেপে রাখলো। এখন নয়। রাত গভীর হলে বাথরুমে গিযে মুঠোফোনটি অন করবে।

বেলা ঠিক ১১টার দিকে ডাঃ সাজিদ এসে উপস্থিত হয় কচিদের বাড়িতে। প্রথম দেখায় কচির চোখমুখে কৌতুহলের ছায়া ফুটে উঠলো। চোখ তুলে চেয়ে আছে বিস্মিত দৃষ্টি! প্রথমে কিছুটা হকচকিয়ে উঠলেও পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, কেমন আছেন?

ভাল, তবে তোমাকে দেখে আমি আশ্চর্য না হয়ে পারছি না।

কেন? আমি একটি মেয়েমানুষ, এতে আশ্চর্যের কি আছে?

তোমার কণ্ঠটা সব সময় আমাকে একটা ঘোরের মধ্যে রাখতো, কিন্তু তুমি যে এতো সুন্দরী তা তো কখনও বলনি? বিশেষ করে তোমার নাক এবং ঠোঁট ভীষণ সুন্দর!

থাক আর পাম্প মারতে হবে না, এবার কিছু মুখে দিন। কচি নিজের হাতে যা যা করেছিল সব কম-বেশী ডাঃ সাজিদকে খাওয়ালো।

বুলোনপুর মোড়টা পার হয়ে কচি আর সাজিদ রিক্সায় উঠলো। অবশ্য বাড়ির কাছেই রিক্সা পেয়েছিল, কিন্তু পাড়ার ছোঁড়াগুলো ভীষণ হারামী। এমনিতেই ঘাড় কাত করে তাকিয়ে থাকে, এক সঙ্গে দেখলে আরও কিছু ঘটাতে পারে।

www.pathagar.com

গল্পে গল্পে রিক্সাটা ভেড়ীপাড়া মোড় পার হয়ে চিড়িয়াখানার সামনে দিয়ে আস্তে করে নেমে গেল টি-বাঁধের দিকে। ঐ মুহূর্তে রিক্সাটা সামান্য লাফিয়ে উঠলো। সাজিদ অনুভব করে কচির শরীরের নরম স্পর্শ। তবে শুধুই স্পর্শ নয়, অন্য রকম এক অজানা অনুভূতি! আজকাল রিক্সাগুলো মনে হয় শুধুমাত্র প্রেমিক-প্রেমিকাদের জন্যেই বুঝি সাইজ করে তৈরি করা হয়। এখনও দুটো শরীর একেবারে পাশাপাশি সেঁটে আছে। সাজিদ এর আগে কখনও নারী শরীরের স্পর্শ পায়নি এমন নয়, কিন্তু আজ ওর মনে হলো, একেবারে নতুন কোনো অনুভূতি। এর আগে হয়তো ওর শরীরে কোনো পুরুষের ছোঁয়া তেমন একটা লাগেনি। কেননা প্রথম যখন সাজিদ ওর হাতটা কচির কাঁধে টেস্ট করার জন্যে আস্তে করে রেখেছিল, তখনই কচি কেমন চমকে উঠে ছিল। প্রথম প্রথম ক'বার একপাশে সরে গিয়েছিল, কিন্তু পরে আর ভদ্রতার খাতিরে তেমন কিছু বলেনি।

টি-বাঁধে নেমে দুজনে পা ছড়িয়ে বসে গল্প করছে আর বাদাম খাচ্ছে। সাজিদকে প্রথম দেখেই কচির মনে হয়েছিল বয়েসটা একটু বেশীই। তবে একটু নয়, ওর চেয়ে মিনিমাম ১০ বছর। পর মুহূর্তেই চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে। আজকাল ছেলে-মেয়েদের এরকম একটা ব্যবধান থাকেই। ক'দিন আগে পাড়াতেই তো ময়নার বিয়ে হলো। স্বামীর বয়েস ময়নার চেয়ে অনেক বেশী। কচি মনকে এই বলে থামালো যে, বয়েস একটু বেশী হলেও সে একজন ভালো নামকরা ডাক্তার। একবার ভাবলো, বিয়ে-থা করেছে কি না জিজ্ঞেস করবে, আবার ভাবলো, না থাক, কেমন নিজেকে স্বার্থপর-স্বার্থপর মনে হচ্ছে। আফটার অল সেতো আমার একজন ফোনিন বন্ধু। না হয় একসময় মোবাইলে জিজ্ঞেস করে নেবে।

কচি দেখলো, ওদের মতো আরও অনেকে দুজন দুজন করে এখানে এসেছে। আজ রোদের তাপ তেমন একটা নেই বললেই চলে। হালকা ঝিরঝিরে বাতাস, এক নিমেষেই মনটা ভরে যায় অন্যরকম আবেশে। হাতের বাদামটা শেষ করে কচি বলে উঠলো, চলো ওঠা যাক। রাজশাহী কলেজের পেছনে পদ্মা পার্কটাও তোমাকে একটু দেখিয়ে নি।

সাজিদ উঠতে উঠতে বলে, আচ্ছা, বললে না তো আমাকে দেখে তোমার কেমন লাগলো?

কচি মুচকি হেসে বলে , কেমন আবার লাগবে, তুমি দেখতে যেমন তেমন লাগলো।

সাজিদ একটু হকচকিয়ে উঠে। পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, এটা কোনো প্রশ্নের উত্তর হলো? এখন দেখছি আমার আসাটাই বৃথা।

ওব- বাবা, এতো বড় মানুষ এখন দেখছি ছোট বাবুর মতো রাগ। ঠিক আছে শুনুন। আমার ভাবনার সঙ্গে আপনার চেহারার অনেকটাই মিল আছে। যদিও স্বাস্থ্যটা একটু বেশী। তবে আমার কল্পনার সবগুলো রঙই আপনার মাঝে বিদ্যমান।

www.pathagar.com

আচ্ছা ওরা কি শুধু টি বাঁধেই ঘুরে বেড়াবে আর কিছু না?
আরে মশাই, এতো ব্যস্ত হলে কী চলে? জীবনের প্রথম দেখা ভেতরের কথাগুলে তো আগে বলতে দিন, তার পর না হয় ঘোরাঘুরি?
পদ্মা গার্ডেন থেকে বেরিয়ে বড়কুঠি পেরিয়ে সাহেব বাজার জিরো পয়েন্টে এসে থামলো। নাহার সন্স-এর ভেতরে গিয়ে ঢুকলো দুজন। দামী সেন্টসহ কিছু প্রসাধনী প্যাকেট করে দোকানী তুলে দিলে কচির সাইড ব্যাগে। সাজিদ অবশিষ্ট টাকা দোকানীর হাত থেকে ফেরত নিয়ে দুজনেই সামনের দিকে এগোলো। কচি অবশ্য সামান্য আপত্তি করেছিল, তবে সাজিদ একরকম জোর করেই কিনে দিলো।
হাঁটতে হাঁটতে দুজনেই এসে থামলো আলুপট্টির সন্নিকটে। গিয়ে ঢুকলো হোটেল কাশ্মিরে। খাবারের অর্ডার দিয়ে সাজেমান বলে, দুপুর যখন হলো, তখন পেটে কিছু দিয়ে আমার হোটেলে সামান্য বিশ্রাম নিয়ে, তারপর বিকেলে জিয়া পার্ক দেখতে যাবো, কেমন?
কচি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লো।
ঠিক ১টা ৫৫ মিনিটে ওরা সাজিদের হোটেলে গিয়ে পৌঁছলো। নির্দিষ্ট রুমে ঢুকে চতুর্দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো কচি। সুন্দর ডিস্টেম্পার করা ছিমছাম ঘর। একটি মাত্র সিঙ্গেল খাট উত্তর দক্ষিণ বরাবর পাতা আছে। পাশেই ড্রেসিং টেবিল, সঙ্গে একটা চেয়ার। এরকম আধুনিক হোটেলের অভিজ্ঞতা এর আগে কখনও ছিল না কচির। মনে মনে ভাবলো, টাকা থাকলে অন্য শহরে গেলেও থাকার জায়গার অভাব হয় না মানুষের জীবনে। এই প্রথম এমন একটি ঘরে সে পা রাখলো। বুকের মাঝখানটায় ওর কেমন যেন একটা অজানা আশংকায় ঢিবঢিব করছে। বিষয়টা বুঝতে পেরে ডাঃ সাজিদ হাসতে হাসতে বলে অমন জড়োসড়ো হয়ে আছো কেন? খাটে এসে রিল্যাক্স হয়ে বসো।
ওর বাহু দুটো ধরে আস্তে করে খাটের পরে বসিয়ে দেয়। ঘরের চর্তুপাশে রুমস্প্রে ছিটিয়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর একটা মোহনীয় ঘ্রাণ বেরুতে লাগলো। কচি দেখলো একটু আগেই প্যান্ট-সার্ট পরা সাহেব মানুষটি ওর সামনেই কেমন প্যান্ট-জাঙ্গিয়া খুলে গেঞ্জি গায়ে লুঙ্গী পরলো। পুরুষ মানুষগুলোর আসলেই লজ্জা একটু কম। তবে ওর ভরাট বুকের পশমগুলো দেখতে ভালোই লাগছিল কচির
বাথরুম থেকে ফিরে এসে সাজেমান মোবাইল অন করতেই বেজে উঠলো সেই গানটি .....

নিখুয়া পাথারে নেমেছি বন্ধুরে
ধরো বন্ধু আমার কেহ নাই
ধরো বন্ধু আমার কেহ নাই....
তোলো বন্ধু আমার কেহ নাই।
অল্প বয়েসে পিরিতি করিয়া

www.pathagar.com

হয়ে গেল জীবনের শেষ
হয়ে গেল জীবনের শেষ
ধরো বন্ধু আমার কেহ নাই....

কচি যখন কল করতো, এই গানটিই শুনতে পেত সাজিদের ফোন থেকে। গানটা শেষ হতেই সাজিদ বলে, কেমন লাগলো?

কচি হালকা হাসির সঙ্গে বলে, দারুণ। সাজিদ সামান্য কাছে এসে বলে, তোমাকেও কিন্তু দারুণ লাগছে। বলে কচির দুবাহু আলতো করে চেপে ধরে।

উঁহু এসব কী হচ্ছে? ছোট্ট বাবুর মতো আর একটু দূরে সরে বসো।

সাজিদ সরে গিয়ে বলে, ওরে বাবা! প্রথম থেকেই এতো শাসন।

প্রথম দিনেই এতো কাছে আসা ঠিক নয়।

এটা আবার কেমন কথা আমি তো দূরেই ছিলাম। তুমিই তো আমাকে কাছে (রাজশাহীতে) আসতে বললে।

বগুড়া থেকে এখানে আসা, আর এই কাছে আসা এক নয় বুঝলে মশাই।

আরও কিছু সময় নানান গল্পে বিভোর হয়ে থাকলো ওরা। হাঠৎ কচি খেয়াল করে, ওর বুকের দিকে তীরের মতো চোখ ফুটিয়ে তাকিয়ে আছে সাজিদ। এতোক্ষণ গল্পের ভেতর খেয়ালই করেনি কচি ওর বুকের একপাশের ওড়না সম্পূর্ণ সরে গিয়েছিল। এবার ঠিকঠাক করে নিয়ে বলে, কি দেখছো অমন করে?

দেখছিলাম তোমার মালাটা।

পুরোনো মালায় দেখবার কী আছে?

হ্যাঁ বড্ড সেকেলে। তবে তোমার জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে।

সারপ্রাইজটা কী?

বললে কি আর সারপ্রাইজ থাকলো। ত্রিশ সেকেন্ডের ভেতর কাগজের মোড়কে জড়ানো কী একটা বের করলো সাজিদ। এবার কচির পাশে ঘন হয়ে বসে । কচি কিন্তু এ মুহূর্তে কিছু বললো না। সাজিদ একেবারে কাছে এসে বলে, চোখ বন্ধ করো?

কচি না সূচক মাথা নাড়ে।

সাজিদ পুনরায় বলে, প্লিজ, চোখ বন্ধ করো।

এবার একরকম ভদ্রতার খাতিরে কচি চোখ বন্ধ করে।

ত্রিশ সেকেন্ড পর সাজিদ ওর হাতদুটো কচির মাথার দু পাশে চেপে রেখে সামনাসামনি বলে, এবার লক্ষী মেয়ের মতো চোখ খোলো।

এতোক্ষণ চোখ বন্ধ করে কচির ভীষণ ভয় করছিল! আশংকা এমন একা ঘরে পুরুষ মানুষ, যদি কিছু করে বসে? কচি চোখ মেলে দেখলো, ওর বুকে ঝুলছে সুন্দর একটি নতুন সোনার চেইন। সাজিদ বলে, পছন্দ হয়েছে তোমার?

www.pathagar.com

এতো সুন্দর জিনিস কার না পছন্দ হয়? তবে এমন একটি দামী হার তুমি আমায় দিয়ে দিলে?

সাজিদ নিজ হাতে মালাটা সুন্দর করে বসিয়ে দিয়ে ওর বাহুদুটো শক্ত করে ধরে বলে, শোনো, পৃথিবীতে নারী-ই এনেছে প্রথম পুরুষের জীবনে পূর্ণতা আর, তুমি আজ এনেছো আমার জীবনে পূর্ণতা। তোমাকে দেখে আমার ভীষণ ভালো লেগেছে কচি। তাইতো আজ আমাদের প্রথম দেখার স্মারক হিসেবে এটা তোমার কাছে রইল। কচি সাজিদের কথায় বিমোহিত হয়ে সামান্য পরে মিষ্টি করে হেসে দেয়, তুমি না দেখেও আমাকে এতো ভালোবাসো?

কচির লাজুক মুখে রক্ত জমে। ভালো লাগার আবেশে নিশ্চুপ তাকিয়ে থাকে সামনের মানুষটির দিকে।

সাজিদ জানে, এমন মুহূর্ত মানুষের জীবনে সব সময় আসে না। পৃথিবীর সমস্ত ভালোলাগা ওর মনের তলানিতে জমা হয়। সামনে বসা কচির গোলাপী ঠোঁট দুটো ওর মনে হলো লিওনার্দো ভিঞ্চির কল্পরূপ–মোনালিসা। সহসা এলোপাথাড়ি চুমু খেতে লাগলো। আবেগে থরথর করে কাঁপছে শরীর। কচি বারবার বাধা দিয়েও ওর বলিষ্ঠ বাহু থেকে সরিয়ে আনতে পারছে না নিজেকে। এক সময় শান্ত হয় সাজিদ।

সাজিদ থামলে কচি খেয়াল করে, তার প্রতিরোধটা খুব একটা প্রবল ছিল না। মালাটা দেয়ার পর কৃতজ্ঞতাবোধের কারণেই হয়তো বা এমন একটি পরিবেশের সৃষ্টি হয় যা ওর শক্ত হওয়া মনের জোরটাকে ক্রমশ দুর্বল থেকে দুর্বলতর করে তোলে। কচি ..... অনুভব করে, এই প্রথম কেউ ওর যৌবনের সিন্দুকে আঘাত হানলো। কিন্তু একি! কচির এমন হচ্ছে কেন? হবে না? প্রথম শিহরণ একটু সমস্যা তো হবেই। কচির সমস্ত মুখচোখ যেন জ্বলে পুড়ে লাল হয়ে যাচ্ছে। সমস্ত গা-হাত পা কেমন যেন শিরশির করে কাঁপছে। শরীরে যেন অজানা একটা ছটফটানি ওকে অস্থির করে তুলছে। অস্ফুটে বলে উঠে, আমার এমন হচ্ছে কেন?

সাজিদ বলে, একটু দাঁড়াও আমি ভালো করে দিচ্ছি। সহসা সাজিদের হাতটা ও পাগলীর মতো খামচে ধরে। সাজিদ শক্ত করে ওর বাহু দুটো চেপে ধরে আস্তে করে একপাশে কাত হয়।

এখন আর কচি কাউকে ভয় পায় না। মনে মনে নিয়ত করেছে, কেউ তেমন কিছু বললে ঠিকানা আছে, সোজা চলে যাবে– বগুড়া।

দেখতে দেখতে কেমন করে যেন পার হেয়ে গেল চার চারটে মাস। প্রথম টের পেল ভাবী জাকিয়া বানু।

কী করে টের পেলো?

www.pathagar.com

আহ্-হা, আগবল ভাতে বাঁ হাত দেবেন না। মন দিয়ে শুনুন, একদিন ভোর বেলা। জাকিয়া বানু দেখতে পায়, কচি অনেকক্ষণ ধরে কাশ আর এমন করছে ব্যাসিনে। বাথরুম থেকে ফিরে আসতে মাথা ঘুরে পড়ে যায় মেঝেতে।

সোনাভান বুড়ি এখুনি ঘটনাটা দেখে গেল। জাকিয়া বানুর টেনশন, যদি না সে পাড়শুদ্ধ রটিয়ে বেড়ায়। যদিও বলে, চোখে কম দেখি মা কিন্তু এ ধরনের ঘটনা ও একট বেশিই দেখে।

জাকিয়া বানু খুব শান্ত গলায় কচিকে জেরা করছে, বল, এমন সর্বনাশ তোর কে ঘটিয়েছে? কিন্তু কচির মুখ খোলানো গেল না।

তিনদিন পর যখন দেখলো আর কোনো উপায় নেই তখন মুখ খুললো কচি। বগুড়ার ডা: সাজিদ, শহরতলীতে বাড়ি। ভিলেজ ডাক্তার। যেন আকাশ ভেঙে পড়লো জামান সাহেবের মাথায়। সমস্ত লজ্জার মাথা খেয়ে জাকিয়া বানু স্বামীকে ধরলো, ওগো তোমার পায়ে পড়ি, তুমি একবার ডা: সাজিদের কাছে যাও। ও শুধু তোমারই বোন নয়, আমি নিজেও ওকে ছোট বোনের মতো মানুষ করেছি। এ সর্বনাশের হাত থেকে ওকে তুমি বাঁচাও। জামান সাহেব মাথা তুলে বলেন, সর্বনাশ তো হয়েই গেছে। তা ছাড়া যাকে আমি চিনি না তার কাছে যাওয়া কি ঠিক হবে?

শোনো, কচি বলছে, তুমি পায়ে গেলে ও নাকি তোমায় তাশায রাখবে । সে ভুল একটা করলেও ছেলে হিসেবে না কি খুবই ভালো। তুমি একটি বার কোনো রকমে ঘুরে এসো, কাজ যদি না হয়, তোমাকে আর এ ব্যাপারে অনুরোধ করবো না।

ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় দুপর একটা। জামান সাহেব সাইড ব্যাগ কাঁধে নিয়ে রিক্সা থেকে নামলো ডা: সাজিদের ফার্মেসীর সামনে। ডাক্তারখানার পাশে আরেকটি ফাঁকা ঘর। এখানে রোগীরা বসে । সব মিলে বোঝা যাচ্ছে রোগীর ভীড় ভালোই হয়। একজন সহকারীও আছে সঙ্গে। তবে দুপুর হয়ে আসার কারণে জন সমাগম কম। দু চারজন বসে আছে।

জামান সাহেব পরিচয় দিতেই আদবের সঙ্গে বসতে দিলো। সহকারীকে ইসারা করতেই কলিজা সিঙ্গারা-চা সামনে এসে হাজির। এক এক করে সব রোগী এমনকি সহকারীকেও বিদায় করে এবার ডা: সাজিদ এসে বসলো জামান সাহেবের সামনে। ভাইজান কেমন আছেন? জামান সাহেবের মাথাটা কেমন যেন ঘুলিয়ে গেল। জাকিয়া বানু ওকে সব শিখিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু এই মুহূর্তে লজ্জায় সব কথা যেন ও ভুলে গেছে। হঠাৎ মনে হলো, যে কথাগুলো ও বলতে এসেছে, সেগুলো কচি আর জাকিয়া বানু একটা চিঠিতে লিখে দিয়েছে।

চিঠিটা বুক পকেটের তলা থেকে বার করে সাজিদের হাতে তুলে দেয়। চিঠি পড়া শেষ হতেই সাজিদের হাত-পা থরথর করে কাঁপছে। একি? মুখ -চোখের চেহারা সঙ্গে সঙ্গে অন্য মূর্তি ধারণ করলো। সাজিদের মুখ থেকে অস্ফুটে বেরিয়ে আসে, না, এটা মিথ্যে

www.pathagar.com

কথা। একাজ আমি করিনি। চার মাস কেন, আমি রাজশাহীতে যাইনি গত দু বছর ধরে। আপনি এবার আসতে পারেন। নইলে ব্লাকমেইলের অভিযোগে পুলিশ ডাকতে বাধ্য হবো।

এতোক্ষণ জামান সাহেব বিনয়ের সঙ্গে চুপচাপ ছিল। যেহেতু ওর হাতি পাঁকে পড়েছে। কিন্তু যখন দেখলো, কচির কথার সঙ্গে ওর ব্যবহারের কোনোই মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না– তখনই লো-প্রেশারের মেজাজটা চটে গেল। সামনাসামনি তাকিয়ে বলে, কুত্তার বাচ্চা, আমার সর্বনাশ ঘটিয়ে আবার আমাকেই তুই পুলিশের ভয় দেখাচ্ছিস। তোর মোবাইলে কথা বলার সব প্রমাণ নিয়ে আমি এখন র‍্যাবের কাছে যাবো।

কিন্তু জামান সাহেবের আর র‍্যাবের অফিসে যাওয়া হলো না। একটা পর্যায়ে ডাঃ সাজিদ হাতের কাছে একটা ব্যবহৃত ছুরি বসিয়ে দেয় জামান সাহেবের বুকের নীচে। দোকান বন্ধ করে দ্রুত পালিয়ে যায় সাজেমান।

ঐ দিন বিকেলে লাশ এসে হাজির হয় জাকিয়া বানুর উঠোনে। দম ফাটানো চিৎকার দিয়ে লাশের ওপর আছড়ে পড়ে জাকিয়া বানু। জামান সাহেবের পরিচয়পত্র বুক পকেটে ছিল। দেখেই পুলিশ লাশ নিয়ে আসে রাজশাহীর বুলোনপুরে।

জাকিয়া বানু প্রথম চিৎকার দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার পর আর মুখ দিয়ে কোন কথা বলেনি। যেন একদম পাথর হয়ে গেছে। কোনো মানুষ তাকে কথা বলাতে পারছে না। তিনদিন পর কচি ভাবীর হাত ধরে টেনে তোলার চেষ্টা করে। ভাবী, ওঠো, চলো মুখে কিছু দেবে। হঠাৎ সবাইকে অবাক করে দিয়ে জাকিয়া বানুর তিনদিন পর জবান খোলে, সরে যা রাক্ষুসী মাগী, তুই আমার স্বামীকে খেয়েছিস। তোর পাপের কারণে আমার নিষ্পাপ স্বামীকে আজ জীবন দিতে হলো। এ তোর পাপের ফসল। এখনও তুই না মরে আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছিস।

অনেক মানুষের সামনে এমন কথা শুনে কেউ কি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে? মুখে আঁচল চাপা দিয়ে দৌড়ে যায় ঘরের ভেতর। দরজা ভেতর থেকে আটকানো। কচি মনটাও ক্রমশ শক্ত হতে থাকে।

কচি ঐ যে দরজা দিল আর কখনও সে দরজা খোলেনি।

www.pathagar.com

ভিমরুল

ভর দুপুরেই ঘটনাটা ঘটে গেলো। ঘটনা বলা বোধ হয় ঠিক হলো না। আসলে দুর্ঘটনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রবেশদার। ফটকের সামনে দিয়েই এলামেলো ভঙ্গিতে হাটছিল বি. জামান সাহেব। গেট পেরোবার আগেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরুনো বাসটা পেছন থেকে সজোরে ধাক্কা মারে। ছিটকে পড়ে পিচঢালা রাস্তার মেঝেয়। গাড়িচালক ব্রেক কষেছিল ঠিকই; তবে আশপাশের পরিস্থিতি বুঝে দ্রুত টান দেয়।

বদিউজ্জামান সাহেব এ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সেকশন অফিসার। অফিসে বি. জামান বলেই পরিচিত। সবেমাত্র পদোন্নতি পেয়েছে। ক্যাম্পাস থেকে বাড়ি মাত্র তিন কিলো। প্রতিদিন হেঁটেই যাতায়াত। অফিস যাবার অনেকগুলো পথ থাকলেও বিশ বছর ধরে যাতায়াত করেন কেবলমাত্র ঐ একটি পথ ধরেই। সময়ের প্রতি তার ছিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। প্রতিদিন বাড়ি থেকে বের হন সকাল সাতটা ত্রিশ মিনিটে। অফিসে উপস্থিত হন পনের মিনিট আগে। গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীত নেই। সঠিক সময়ের পূর্বেই পৌঁছে যান অফিসের নির্দিষ্ট কক্ষে। ফেরার সময় ডিপার্টমেন্ট বিল্ডিং থেকে নেমে অতি সন্তর্পনে নিয়ম মাফিক পথচলা। দেবদারুগাছের ছায়া মাড়িয়ে এগিয়ে যান মেইনগেট। বড়রাস্তা পেরিয়ে পাশে হযরত মতি শাহ'র মাজার। মাজার রেখে বাম পাশে ঢুকে যান রেডিও সেন্টারের ভেতরে। পায়েচলা ঘুড়ির লেজের মতো আঁকা-বাঁকা পথ। রেডিও সেন্টার পেরুলেই পা রাখেন নিজ মহল্লায়। এক সময় পৌছে যান নিজ আশ্রয়স্থল। টিনের ছাউনি, ইটের দেয়াল। ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দেন নিশ্চল খাটের ওপর।

ক'দিন থেকে একটা টেনশন মস্তিষ্কে অহর্নিশ কাজ করছে। বড় দুটো মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। ছোট মেয়ে মিতা স্কুল পেরোয়ে সবে মাত্র কলেজে উঠেছে । একমাত্র ছেলে

www.pathagar.com

রতন অনার্স পাশ করে ভর্তি হয়েছে এম.এ ক্লাশে। বড় মেয়ের জামাই ভীষণ বদরাগি। যেমন অলস, তেমনি হাত খরচের অভ্যাস। বিয়ের পর অনেক ক'বার জামান সাহেব-এর নিকট থেকে টাকা নিয়ে গেছে ব্যবসার নামে। তিন মাস না পেরোতেই আবার ছুটে আসে। কোনো মতে টাকাটা ফুরোলেই হয়। এই তো মাস তিনেক আগে হঠাৎ স্ত্রী-সন্তান নিয়ে শ্বশুর বাড়ি হাজির। এসে প্রথম আর্জি বাবা, শীত মৌসুমে ভালো একটা ব্যবসার সন্ধান পেয়েছি। চাদরের ব্যবসা। কিছু মানে ক্যাশটা না দিলেই নয়।

জামান সাহেব অনেক কষ্টে কিছু টাকা সংগ্রহ করে জামাইয়ের হাতে তুলে দেন। এরপর মেজ মেয়ে রূপা, ওর জামাইকে নিয়ে একমাস পরে এলো। মেজ জামাইয়ের ব্যবহার বড়টার চেয়ে অনেকটা ভালো। রূপা'র একটা কলেজে চাকুরি হয়েছে প্রভাষক পদে। শ্বশুরের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নিতে এসেছে কলেজে ডোনেশনের পঞ্চাশ হাজার টাকা। জামান সাহেব ওয়াদা করেছিলেন, তাই অতিকষ্টে জি.পি.এফ. থেকে অগ্রিম নিয়ে তুলে দেন রূপার হাতে। কষ্ট হলেও জামান সাহেব টাকাটা দিতে পেরে অনেকটাই হালকা অনুভব করছিলেন। কিন্তু এক সপ্তাহ না যেতেই বড় জামাই-মেয়ে এসে হাজির। বড় মেয়ের ঐ এক-ই কথা—আমাদেরকে পাঁচ হাজারের বেশি কখনই দাও না। আর রূপাকে ৫০ হাজার কেমন করে দিলে বাবা? আমি কি তোমার কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে...? জামান সাহেব মেয়েকে অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করছেন, দেখ মা, তুই তো ভালোমত লেখাপড়া শিখলি না। রূপা যথেষ্ট পরিমাণ পড়ালেখা করেছে। যোগ্যতা কাজে লাগানোর জন্যে আমার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ওকে দিয়েছি। তোর বোন একজন কলেজের শিক্ষিকা এটা কি তোর গর্বের বিষয় নয়? তাছাড়া পরিমাণে কম হলেও তোকে যা এ যাবৎ দিয়েছি, পঞ্চাশ হাজারের বেশী বই কম হবে না। তুই জামাইকে নিয়ে ফিরে যা মা, আমার কাছে আর একটি টাকাও নেই।

এরপর মা-মেয়েতে অনেক ঝগড়াও হয়। এমনকি জামান সাহেবের দেয়া রিক্সাভাড়ার টাকাটাও যাবার সময় নিতে চাইলো না। যেমন হনহনিয়ে এসেছিল তেমনি শনসনিয়ে চলে গেল।

ড্রইংরুম। জানালার পাশে পেতে রাখা চেয়ার। বসে আছে জামান সাহেব। জানালার ওপাশে চালতাগাছ। পড়ন্ত বেলার আদুরে হাওয়ায় টুপ করে খসে পড়ে চালতার দু'টো বড় বড় পাতা। জামান সাহেব ভাবে, বিগত বছরগুলো ওর কর্মময় জীবন থেকে এমনি করেই খসে গেছে। বহু কষ্টে বাড়ির পাশের ফাঁকা জায়গাটায় উঠিয়েছে পাঁচটি ঘর। ঘর কেন বাড়ি-ই বলা চলে। হোক না টিনের ছাউনি ইটের উপর, তবু বানিয়েছে তো? প্রতি বছর ঈদ আসে ঈদ যায়। এতে বাড়ির কারো ত্যামন কিছু যায় আসে না। এ নিয়ে ছেলে-মেয়েরা ভাবেও না। তবে জামান সাহেব ভাবে, ৩৫ বছরের জীবন চলার একমাত্র সঙ্গি দোলনাকে নিয়ে ভাবে। প্রতি বছর ঈদের সময় উৎসব ভাতা, পাশাপাশি অফিসার হওয়ার আগ পর্যন্ত মোটা অংকের এ্যাডভান্স, সেই সঙ্গে আরও কিছু দোলনার

www.pathagar.com

জোড়াতালি দিয়ে কেনা হয় বাড়ি-নির্মাণ সামগ্রী। একটু একটু করে পাঁচ-ছ'টি রুম অনায়াসে হয়ে যায় ভাড়া দেয়ার উপযোগী। জামান সাহেব হিসেবি মানুষ। ভাড়া দিয়েছেন ঠিক-ই, তবে বাসাবাড়ি নয় মেসবাড়ি। এরপর থেকে জামান সাহেবের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা অনেকটা ফিরে আসে। তবে মেসভাড়া দেবার পর থেকে সমস্যারও অন্ত নেই। প্রতি রুমেই দুটো-একটা করে সিট খালিই পড়ে থাকে। আজ কালকার ছেলে-ছাত্ররা ওর চাইতেও চতুর। অনেক দিন পর হলেও ছাত্রদের চালাকি একবার হাতেনাতে ধরে ফেলে। একজন নতুন মেস সদস্যকে এক মাস মেহমান হিসেবেই ওদের মেসে ছাত্ররা রেখে দেয়। ঐ ছাত্রের ভাড়ার টাকাটা বাকি ক'জন মেরে দেয়। অর্থাৎ থার্টি ফাস্ট নাইটে ফুর্তি করে। শুধু কি তাই! এমন অনেক ছাত্র-ই আছে—যারা আলো থাকা সত্ত্বেও অযথা দিনের বেলা বাল্ব জ্বালিয়ে রাখে। বাথরুমের আলো শোবার সময় প্রতিদিন নেভানোর কথা বলতে হয়। ট্যাপ দিয়ে পানি অপচয় হচ্ছে—অথচ কারও মাথা ব্যাথা নেই। এই তো সেদিন। চারবন্ধু সিঙ্গেল সিটে রঙ-তামাসা করতে করতে ওর নতুন চৌকির একটা পায়া ভেঙে দেয়। একেক বার জামান সাহেব আচ্ছা করে বলে—তবু ছেলেগুলোর লজ্জা-শরম বলতে কিচ্ছু নেই। ফ্যাল ফ্যাল করে শুধু তাকায়। এক ছেলে তো রীতিমত ঘরের ভেতর ডাইল খাওয়া ধরেছিল। অনেক কৌশলে মাথা খাটিয়ে ওকে বিদেয় করেছে জামান সাহেব

এরপর বেশ কিছুদিন মেস বাড়ির খবর ভালোই ছিল। হঠাৎ দোলনা সেদিন কাছে ডাকে। কানে কানে বলে, মেসের কোন ছেলে ওদের ছোট মেয়ে মিতাকে নাকি চোখ মেরেছে। শুনে তো মাথার চাঁদি গরম হবার উপক্রম। দোলনাকে বলে, তাহলে ভেবে দেখ, কি সাহস—ঐ একরত্তি ছেলের! সারাজীবনে কাউকে একবারও চোখ মারলাম না, আর এ্যাডমিশন টেস্টে এসেই এই কাজ?

স্বামীর এ কথায় দোলনা ফিক্ করে হেসে দেয়। জামান সাহেব স্ত্রীর ওপর চটে ওঠে!

আমার মেয়েকে কোন হতচ্ছাড়া চোখ মেরেছে, আর তুমি হাসছো?

দোলনা ধীরে ধীরে বলে, মেয়ের কথা শুনেই চটে যাচ্ছো, আমার কথা তো শোন-ই নি। জামান সাহেব সামান্য গলা চড়িয়ে বলে, তোমার আবার কী- হলো?

আমার ভয় করছে বাবা বলবো না।

ভয় নেই, সত্য কথা খুলে বলো।

জানো, সে দিন আমাদের মেসে এক ছাত্র মেহমান এসেছিল। আমার পরনে ছিল সালোয়ার-কামিজ। ক্রিমের উপর সামান্য পাউডারের প্রলেপ দিয়ে ওপাড়া যাচ্ছিলাম। ঐ মেহমান ছাত্রটা কি করলো জানো?

কী করল জলদি বলো?

আমাকে দেখা মাত্র...

তোমাকে দেখা মাত্র কী?

www.pathagar.com

মানে, মানে...
ওসব মানে মানে বাদ দাও। পুরোটা খুলে বলো।
বলবো?
জামান সাহেব গলা ফাটিয়ে বলে, বলবো নয়—বলে ফেল।
ঐ মেহমান ছাত্রটা স্বয়ং আমাকেই চোখ মেরে দিল।
কী! চালচুলোহীন হতচ্ছাড়ার বাচ্চার এতো বড় সাহস? কিছুক্ষণ থেমে জামান সাহেব বলে, তুমি তখন কী করলে?
আমিও পাল্টা শোধ নিয়েছি।
কী ভাবে?
কেন বুঝলে না। ওর চোখ আমাকে মেরেছিল। আমার চোখ ওকে মেরে দিলাম।
কী সাংঘাতিক! এ কাজ কেন তুমি করতে গেলে?
এরপর জামান সাহেব ছুটি ভোগ করলেন বাড়িতে বসেই সাত দিন। শুধু ভাবে, এমন যুগে বাস করতেও ঘেন্না লাগে। মেয়েটার বয়স না হয় কম, কিন্তু এ বয়সে বউটাও রক্ষা পেল না। অবশ্য ওর চেয়ে শরীর-স্বাস্থ্য দোলনার বরাবরই ভালো। পরক্ষণে দোলনার ওপর রাগ হলো। কেন বাবা, এ বয়সে সালোয়ার-কামিজ পরার কী দরকার ছিল? দেশ গুনে বেশ। শাড়িই তো এ দেশে সবচেয়ে মানানসই। আবার ভাবে বউটা না হয় সখ করে একটু পরেই ছিল, তাই বলে হারামির বাচ্চাটা চোখ মেরে দিলো?
হঠাৎ একদিন ছাত্ররা মেসঘরে মিটিং ডাকে। জামান সাহেবের বসার জন্য একটি হাতাঅলা চেয়ার সংগ্রহ করে সামনে পেতে রাখা। জামান সাহেব বসতে বসতে দেখলেন, প্রত্যেকের চেহারায় আনন্দের ঝলকানি কেমন চকচক করছে! চা-নাস্তার পর্ব শেষে ঐ চতুর ছেলেটা বলে, আংকেল, আমাদের একটা ছোট্ট প্রস্তাব ছিল।
জামান সাহেব আনন্দ চিত্তে বলে, তা বলো, এতে সংকোচের কী-আছে।
আংকেল, প্রায় মেসে কম-বেশী টিভি আছে। ডিশলাইনসহ একটা কালার টিভি-র ব্যবস্থা হলে আমাদের আর অন্য মেসে যেতে হয় না।
জামান সাহেব বেশ কিছুক্ষণ পর নিচমুখি মাথাটা সোজা করে বললেন, ঠিক আছে, বিষয়টা আমি ভেবে দেখবো।
নিজের ঘরে দোলনাকে গিয়ে বললেন, মিতার মা, মেস উঠিয়ে দেব।
হঠাৎ এ কথা?
এতো যন্ত্রণা আর সহ্য হচ্ছে না। শুধু টাকা আর টাকা! এর চেয়ে মেস বন্ধ রাখা অনেক ভালো।
দোলনা তার সুখ-দুঃখের একমাত্র সাথী। অনেক করে বোঝালো, দেখ প্রতিযোগিতার যুগ। কম-বেশী সব মেসেই তো আছে।
জামান সাহেব ইতস্তত গলায় বললেন, ওদের লেখাপাড়া?

www.pathagar.com

অতো দেখে তোমার কী লাভ? ওদের ভালো-মন্দ ওরাই ভালো বোঝে। টিভি একটা কিনে দাও—ল্যাঠা চুকে যাক। ব্যাস।

মুখে বললে কী হলো। শেষ পর্যন্ত টিভি কিনে দিতেই হলো।

এরপর আর মাস খানেক কোনো সমস্যা ছিল না—জামান সাহেবের টানা-কসার সংসারে। কিন্তু না, শান্তিতে ঘুমোবার উপাই নেই। সমস্যা জমাট হয়ে আরও ঘনিভূত হয়। মেসের ছাত্ররা রাত জেগে টিভি দেখে। কেউ কেউ ঘুম থেকে ওঠে সকাল ন'টায়। মেসবাড়ির সামনে পুকুরে যাবার সরু রাস্তা। কদমতলায় দাঁড়িয়ে-বসে দাঁত মাজে আধা ঘন্টা ধরে। পাড়ার যুবতী মেয়েরা পুকুরে যায়; ছেলেরা তখন হা করে গিলে। ফ্যাল ফ্যাল করে বাঁকা চোখে তাকায়। শুধু তাকালেও হয়তো চলতো। কারণ, দেখলে তো আর চেহারা ক্ষয় হয়ে যায় না। কিন্তু তা-না, দু'একটা রসাত্মক কথা মেয়েদের দিকে ছুঁড়ে মারে,—দোস্তো দিন দিন সাইজ দেখি বাড়তে আছে।

জামান সাহেব চাকুরী ছাড়াও আর একটি কাজ করেন। বিকেলবেলা পাড়ার মক্তবে ছোট ছেলে-মেয়েদের আরবী পড়ান। মসজিদের ইমামের পাশাপাশি তিনিও মাস গেলে কিছু পান। শুধু পাওয়াটাই বড় কথা নয়। ওস্তাদজী বলে ডাকলে দিলটা আরসিকোলার মতো ঠাণ্ডা হয়ে যায়। সেদিন মক্তব থেকে ফেরার পথে পাড়ার দু'জন মুরুব্বী রাস্তাতেই ওস্তাদজীকে নালিশ জানায়। দেখেন জামান সাহেব, পাড়ার মধ্যে তো ম্যাস চালানো মোটেই ঠিক না। তার পরও চালিয়ে যাচ্ছেন। আমরাও কিছু বলিনা, আপনিও ভালোই কামাচ্ছেন। এদিকে বউ-ঝি নিয়ে বাস করা আমাদের এক রকম বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনার মেসের ছেলেরা মেয়েদের দেখলেই অশালিন বাক্য ছুঁড়ে মারে। আপনি মালিক, একটা কিছু করুন।

জামান সাহেব ওদের দিকে খুব একটা না তাকিয়ে শুধু বললেন, ঠিক আছে আমি দেখছি, বলে সোজা বাড়ি চলে আসে।

মেসের যেগুলো ভালো ছেলে তাদের থেকে আরও অনেক তথ্য পাওয়া গেল। ডিশ এ্যান্টিনা আর রঙিন টিভি। ছেলেরা যেন সারারাত স্বপ্নের রাজ্যে বিভোর হয়ে বাস করে। রাত দু'টো. তিনটে-এমনকি চারটে পর্যন্তও টিভি চলে ধুম্-ধাড়াক্কা! হিন্দী ফিল্ম আর সিরিয়াল-এর চলতে থাকে নীরব প্রতিযোগিতা। নেশা ধরে যায় রঙিন চোখে। ঐশ্বরিয়ার রূপের প্রাচূর্যময় ঝলকানি, নেহা-ধুপিয়া আর মেঘনার প্রায় উদোম শরীরের ভাঁজে ভাঁজে, যৌবনের মোহনিয় সুধার আকর্ষণ, কারিনা'র মেলামাইনের মতো মায়াবী চেহারার মাঝে বাঁশির মতো সুতীক্ষ্ণ লম্বা নাক, প্রীতি জিনতার আপেলের মতো মিস্টি হাসি, কারিশমা'র চোখ ধাঁধানো অঙ্গের তেলেসমাতি, আর রাণী মুখার্জীর বিশ্বসেরা চোখের আবেদনময়ী চাহনি—সেই সঙ্গে দোলায়িত পুষ্ট দেহের বাঁকে বাঁকে যৌবনের একেকটা পাঁপড়ি সুধা খসে খসে ঝরে পড়ে। সকাল হলেও এসব ছেলে-ছোকরাদের চোখের ঘোর কাটে না। কোটিদেশ ছাড়া নগ্ন শরীরের নেশার ঘোরে বুঁদ হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

সকালবেলা এসব ছেলেরাই রাতের দেখা স্বপ্নের সুধা পান করতে না পেরে পাড়ার যুবতী মেয়েদের দিকে লালাসাক্ত চেহারায় চেয়ে থাকে।

অফিস থেকে ফিরে জামান সাহেব মেস বাড়ির ঘরে ঘরে নোটিশ টানিয়ে দিলেন—বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে প্রত্যেকেই বিনা বাক্যে মেস ছেড়ে অনত্র চলে যাবে। আদেশক্রমে, বি. জামান সাহেব।

শোবার ঘরে ঢুকতেই জামান সাহেবকে দোলনা বলে, দরোজাটা ভেজিয়ে দিতে পারো না। জামান সাহেব দোলনার দিকে অপলকে তাকায়। অন্যদিনও স্ত্রীর দিকে তাকায়, কিন্তু আজ আর চোখ ফেরে না। দোলনা সুন্দর করে খোপা বানিয়ে চুল বেঁধেছে। মেয়েটা দুষ্টুমি করে ক'টা ফুলও গুঁজে দিয়েছে। ঘরময় প্রসাধনের মিষ্টি ঘ্রাণ। নাকে এসে ঠেকছে ভালবাসার সৌরভময় দীপ্তি। সম্পূর্ণ আনকোরা সাইজের টিয়ে রঙ ব্লাউজ। চুমকী বসানো হলদে-সবুজ কচি নিমপাতা রঙ শাড়ি। জামান সাহেব পরিচ্ছন্ন ঘরের আয়োজন আর ঘরণীর সবকিছুর পরিবর্তন দেখে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে দোলনার দিকে তাকায়।

দোলনা নিচু গলায় অভিমান মেশানো কণ্ঠে বলে, ক্যালেন্ডার দেখ তো—আজ কত তারিখ?

দেয়াল পঞ্জিকায় চোখ বুলিয়ে প্রায় ত্রিশ সেকেণ্ড পর সবকিছু ঠাওরাতে পারে জামান সাহেব। সত্যিই সে ভুলে বসে আছে, আজ তার বিয়ে বার্ষিকীর দিন। জামান সাহেব অফিস থেকে ফেরার পথে রেডিও সেন্টারের গেটে ঢুকতেই দেখে অনাদরে কিছু হলুদ ফুল পড়ে আছে। তারই ক'টা অনায়াসে তুলে নেয় হাতে। কোটের পকেট থেকে বের করে দ্বিধা—সংকোচ মাড়িয়ে তুলে দেয় দোলনার হাতে। দোলনা পারিপার্শিকতাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে জড়িয়ে ধরে—সংসার নামক জটিল জাহাজের হাল ধরে থাকা এক বিধ্বস্ত নাবিককে। মুছে দেয়ার চেষ্টা করে মলিন চেহারায় ছেয়ে থাকা বিষণ্ন চিন্তার রেখাগুলো।

জামান সাহেব অনুভব করে, এমন স্ত্রী আছে বলেই তো জটিল সংসারের স্বেচ্ছায় এমন ঘানি টানা। কিন্তু এ সমাজ-রাষ্ট্র-প্রশাসন-পরিবার-এমনকি সন্তানেরা পর্যন্ত অকৃত্রিম এ অনুভূতিকে বুঝে ওঠার চেষ্টা করে না।

দোলনার সঙ্গে অনেক আলাপ-আলোচনার পর জামান সাহেব সিদ্ধান্ত নিলেন, ছাত্রবাস তুলে দিয়ে ছাত্রীনিবাস গড়ে তুলবেন। ধারণা, ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা অনেক সংযত চলবে, আর এটাই স্বাভাবিক।

দিন যাচ্ছে-মাস যাচ্ছে তবু সংসারের টানা-কষা মোটেই যাচ্ছে না। ছেলে-মেয়ের চাহিদা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। জামান সাহেব এবার ছেলের চাকুরীর ব্যাপারে ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান-এর সঙ্গে আলাপ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

www.pathagar.com

দেখতে দেখতে ছোট মেয়েটি কেমন ডাঙর হয়ে উঠেছে। কলাগাছের মতো প্রতি দিনই বুঝি বাড়ে, নইলে কম বয়সে এতো লম্বা হলো কী করে? বড় দু'টো মেয়ে পরের ঘরে, মিতা-ই এখন ওদের ভরসা। প্রকৃতির মতো বাড়ির পরিবেশের ও একাই ভারসাম্য রক্ষা করে। মেয়েটি বড়ই চঞ্চল। তবে পড়ালেখায় বেশ ভালো। এস,এস, সি'তে 'এ গ্রেড' পেয়েছে। প্লাস না পাওয়ায় তিন দিন ঘরে বসে কেঁদেছে।

শেষমেষ ছেলে রতনের ব্যবস্থা একটা হলো। তবে সহজেই হয়নি। এর জন্য জামান সাহেবকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান বেশ কিছু শর্ত তার মাথার ওপর ঝুলিয়ে রেখেছে। সেই শর্তের ভেতর বিরাট ত্যাগ স্বীকার করতে হবে কথাটি লেখা না থাকলেও জামান সাহেব তা বুঝতে পারে। কেন না চুল তো বাতাসে পাকেনি, পেকেছে বয়েসে। তবে ছেলের চাকুরী বলে কথা। নইলে কখনই তিন তা মেনে নেয়ার পাত্র নন।

ছ'মাস ধরে জামান সাহেব অফিস নিয়ে বেশ চাপের মুখে আছেন। সেকশন অফিসার বটে, তবে কাজ তো আসলে একজন কেরানীর। ডিপার্টমেন্টের হাজারো কাজ—সারাদিন কলম পিশেও শেষ হবার নয়। একএক বার মনে হয়, চাকুরী নয় এ যেন চেয়ারম্যান-এর হুকুমের গোলামী। জরুরী একটা নোট করছেন হঠাৎ চেয়ারম্যান-এর প্যারালাল ফোন বেজে উঠে। এ বয়সে ধীরে চলার অবকাশ নেই, দৌড়ে গিয়ে পৌঁছতে হয় চেয়ারম্যানরুমে। চেয়ারম্যান তো চেয়ারম্যান- ই। পৌঁছে সালাম দিলেও উত্তরের বালাই নেই। এটা এক্ষুণি কম্পিউটারে দিন, ওটা জরুরী ভিত্তিতে রেডি করুন। নোটিশটা এখনও টানানো হয়নি? সবশেষে হেড়ে গলার কেমন একটা খ্যাক খ্যাক শব্দ যা অসন্তুষ্টির সংকেত বহণ করে।

চেয়ারে বসতে না বসতে পুনরায় টেবিল কাঁপিয়ে ফোন বাজে। দিনে যদি দশ-পনেরবার চেয়ার ছেড়ে উঠতে হয়, তবে কাজগুলো সারবে কখন? এ বছর ডিপার্টমেন্টে এক তরুণী ম্যাডাম মানে প্রভাষক যোগদান করেছে। তার চলাফেরা তো আরো অন্য রকম। কখনও অফিস রুমে ঢুকে আগে সালাম দেন না। সব সময় তাড়া আর ব্যস্ততা কোমরে বেঁধেই অফিসে ঢোকেন।

অফিসে বুঝে কাজ করার মতো লোক, মূলত তিনজন। একজন বৃদ্ধ ক্লার্ক আফসার উদ্দীন, একজন কম্পিউটার অপারেটর, টাইপ থেকে হালে কম্পিউটার পেয়েছে, নাম রফিক মিয়া। আর একজন জামান সাহেব নিজেই। আফসার উদ্দীন বৃদ্ধ হলেও কাজ ভালো বুঝতেন। তবে তিনি এখন আর এখানে নেই। অবসর নিয়েছেন মাস ছ'য়েক আগে। আর রফিক তো মিয়া বংশের ছেলে। ভীষণ ফাঁকিবাজ। বেলা একটা কোনো মতে বাজলেই হয়। আর খবর নেই। একটু থেমে যেতে বললে, বলে কি-না, ভাই আমার সময় নেই। লেট করলেই দেরী হবে, বাস পাবো না। চাপাচাপি করলে মুখের উপর বলে বসে, বাসভাড়া কি আপনি দেবেন?

www.pathagar.com

আফসার উদ্দীন অবসর নিলে দু'জনের কাজ একাই করতে হয় জামান সাহেবকে। প্রতিদিনই কাজের চাপ কমে না। ভর্তির সময় তো টয়লেটে যাবার সময় পর্যন্ত পায় না। অনেক সময় পিয়ন ছোকুকে দিয়ে আমতলা থেকে কাজরীর হাতের মাসকালাইয়ের রুটি এনে পেট শান্ত করতে হয়। দু'টো পর্যন্ত অফিস করার নিয়ম থাকলেও বিকেল পাঁচটা-ছ'টা পর্যন্ত প্রায় দিন অফিসে থাকতে হয়। এক সময় জামান সাহেব হাঁপিয়ে ওঠেন। একজন লোকের প্রস্তাব দেন। চেয়ারম্যান লামছাম দিয়ে একজন নতুন লোক রাখার কথা বললে জামান সাহেব হালে পানি পান। সুযোগ বুঝে গ্রাজুয়েট ছেলে রতন আর তার টানাটানি সংসারের কথাটা তুলে ধরেন। চেয়ারম্যান কৌশলে কিছু অলিখিত শর্তে রাজি হয়ে যান। সে থেকে ছেলের চাকুরী পার্মানেন্ট হবার প্রত্যাশায়, নামকা ওয়াস্তে ছেলে থাকলেও, একাই তাকে সিংহ ভাগ কাজ করতে হয়।

দেখতে দেখতে একটি বছর কেমন করে পার হয়ে যায়, কিন্তু ছেলের চাকুরী স্থায়ী হয় না। এমনকি মাষ্টাররোলের অর্ডারটাও চেয়ারম্যান এনে দিতে পারলো না।

সবেমাত্র জামান সাহেব বাড়ি ফিরেছে। কিন্তু প্রতিদিনের মতো মিতা এসে গেট খুলে দিল না। হাতের ব্যাগটাও নেওয়ার জন্য কেউ এগিয়ে এলো না।

সবকিছু কেমন নিরব-নিস্তব্ধ! কেমন একটা মনমরা ভাব।

ড্রেসিং টেবিলের পাশে খাটের হাতলে হেলান দিয়ে বসা দোলনা। চেহারায় নেই কোনো প্রাণচাঞ্চল্য। সন্ধে ছুঁই ছুঁই, তবু জ্বলে উঠেনি ঘরের আলো। মিতার জন্যে নিয়ে আসা থ্রীপিচ-এর প্যাকেটটা জামান সাহেব নিজেই আলতো হাতে রেখে দেয় টেবিলের উপর। ধীর লয়ে অতি সন্তর্পনে এগিয়ে যায় দোলনার দিকে। দোলনার ফ্যাকাশে সাদা মুখখানা দু'হাতে ধরে জিগ্-গেস করে, মিতার মা, বাড়ির অবস্থা এমন কেন? কী হয়েছে বলবে তো?

দোলনা চোখ তুলে তাকালো ঠিক-ই, তবে ঠোঁট দু'টো কাঁপছে। পানিতে ডুবে যাওয়ার পূর্বমুহূর্তে মানুষ যেমন ভাবে খড়কুটো আঁকড়ে ধরে—স্বামীর হাত দু'টো তেমনি শক্ত করে জড়িয়ে ধরে দোলনা। কান্নাজড়িত কণ্ঠে যা বললো, সংক্ষেপে তার মানে দাঁড়ায়, মাসুম নামের এক বখে যাওয়া ছেলের সঙ্গে মিতা পালিয়েছে। দোলনা বিষয়টা শোনার পর জামান সাহেবকে না জানিয়ে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ নিয়েছে। শেষমেষ জানতে পারে, ছেলেটা প্রাণভয়ে ওর কোনো এক আত্মীয়ের বাড়ি আশ্রয় নিয়েছে।

জামান সাহেব ম্যাচের কাঠি বারুদে ঘষা দিয়ে আগুন ধরালেন। মিতার জন্যে নিয়ে আসা থ্রীপিচ রাখা মোড়ক-এর এক প্রান্ত ধরে অপর প্রান্তে আগুনের লেলিহান শিখা ধরিয়ে দিলেন। শুধু কাপড়ের সুতোই পুড়ছে না, জীবনের চরম ক্ষোভ, দুঃখগুলো যেন একটা একটা করে পুড়ে ক্রমশ নিঃশেষ হচ্ছে। কাপড় পুড়ে ছাই-এর স্তূপ সামনে। এরপর জামান সাহেব যা করলেন, যে কেউ পাগল ঠাওরাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পায়ের জুতো খুলে স্তূপিকৃত ছাই-এর উপর পেটাতে শুরু করলেন।

www.pathagar.com

জামান সাহেব কোনো সংবাদ না দিয়ে আজ অফিসে গেলেন না এই প্রথম। ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত বিল্ডিং-এর ভগ্নাবশেষ কাঁধে আটকে যাবার মতো জামান সাহেবের অবস্থা। ছোট মেয়ে মিতার মাঝে অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন। মেয়েটির মেধা ছিল অত্যন্ত প্রখর। ওকে নিয়েই নিজেকে ভাবতে চেয়েছিলেন গর্বিত সন্তানের পিতা। লোক-লজ্জার কথা জামান সাহেব কখনই ভাবেন না। কিন্তু তাই বলে মেধাবী একটা মেয়ে পাড়ার বখে যাওয়া ছেলের সঙ্গে চলে যাবে? বাবার আদর-'মা'য়ের স্নেহ-উচ্চশিক্ষা-পারিবারিক বন্ধন-জীবনে প্রতিষ্ঠা-বাবার স্বপ্ন সব কিছুই ওর কাছে তুচ্ছ?

তিন দিন অনুপস্থিত থাকার পর অফিসে গেলেন জামান সাহেব। আমতলা গিয়ে কড়া লিকারের একটা চা খেলেন। মাষ্টাররোলে লোক নিয়োগের বিষয়টা জামান সাহেব আমতলাতেই প্রথম জানতে পারে। সিঁড়ি ভেঙে অফিসের তিন তলায় উঠতে তার মনে হলো, আরও একটি আকাশ তার মাথায় ভেঙে পড়ার জন্য অপেক্ষমান। আজ আর চেয়ারম্যান সাহেবকে ফোন করতে হয়নি। জামান সাহেব নিজেই গিয়ে চেম্বারে উপস্থিত। ভূমিকা ছাড়াই বললেন, স্যার আমার ছেলেটা তো এক বছর ধরে এ অফিসেই বিনে পয়সায় কাজ করছে। শুনলাম মাষ্টাররোলে লোক নিয়োগের সার্কুলার হয়েছে। শেষমেষ যদি আমার ছেলেটা বাদ পড়ে যায়! চেয়ারম্যান টেবিল থেকে মাথা তুলে বিস্ফারিত চোখে তাকালেন। ভাবখানা এমন—জামান সাহেবের পুরো চেহারাটায় যেন সেটেলমেন্ট অফিসের মতো পুঙ্খানুপুঙ্খ জরীপ চালালেন। তবে পরক্ষণে চোখ নামিয়ে ধীর লয়ে বললেন, দেখুন জামান সাহেব, আপনার ছেলের বিষয়ে কোনো চিন্তা করবেন না। আমি ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান হিসেবে বলছি শুধু তাই-ই না। জানেন তো ভিসি স্যারের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক যথেষ্ট ভালো। এছাড়া আমি বলেও রেখেছি। সার্কুলার হয়েছে, ছেলেকে দরখাস্ত করতে বলুন। নিশ্চিত ওর চাকুরীটা হবে। শুধু হবে তাই না পার্মানেন্টও হবে। এখন নিশ্চিন্ত মনে জমে থাকা কাজগুলো শেষ করুন। ও হ্যাঁ, আফসার উদ্দীনের শূন্য পদের ফাইলটা এক্ষুণি পাঠিয়ে দিন।

গেল হপ্তার পুরো সপ্তাহটায় জামান সাহেব সর্দিজ্বরে ভুগলেন। আজও পা বাড়ালেন অফিসের পথে। ক্যাম্পাসে ঢুকেই চোখ দু'টো কেমন স্থির হয়ে চেয়ে থাকে। গাছের নিচে দু'টো ছেলে-মেয়ে বসে আছে পাশাপাশি। এমন একটা বিশেষ মুহূর্ত দেখে মনটা ভীষণ রকম চটে ওঠে। মনে মনে ভাবলেন, কষে দু'টো চড় বসিয়ে দিতে পারলে ভালো হতো। অফিসে গিয়ে দেখলেন, ছেলে রতন অফিসের সামনের করিডোরের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে।

কিরে এখানে কেন, কাজে বসিস নি?

না বাবা, আমার চেয়ারটা অন্য একজন দখল নিয়ে বসে আছে।

বলিস কি, আয় দেখি।

www.pathagar.com

ধীরে ধীরে চতুরতার কালো মেঘ সরে গিয়ে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে ওঠে জামান সাহেবের সামনে। এতাদিন শুধু ওর মুখের সামনে মুলো ঝুলিয়ে রেখেছিল চেয়ারম্যান সাহেব। কারণ একটাই। অফিসের দ্বিগুণ কাজ জামান সাহেবের নিকট থেকে আদায় করে নেয়ার জন্যে। টেবিলে বসেই দেখলেন, একজন নতুন ছেলের কাজে যোগদান পত্র। ছেলেটার বয়স রতনের মতোই। আকাশ যেটুকু আটকে ছিল, আজ যেন পুরোটাই ওর মাথার উপর ভেঙে পড়ে। আরও জানতে পারে টাকার বিনিময়ে এ নিয়োগটা বদলে গেছে। সম্পূর্ণ আনকোরা নতুন একটি ছেলে, ওর ছেলে রতনের স্থানে দিব্যি বসে নির্বিঘ্নে কাজ করছে। টেলিফোনে কাকে যেন বললে, খালুজান, আমার একটা ভালো চাকুরী হয়েছে। আজ-ই জয়েন করলাম।

জামান সাহেব ঘাড় তুলে তাকালেন, ঠোঁট দু'টো কেউ যেন গাম দিয়ে পুরোটা এঁটে দিয়েছে। বিস্ফারিত চোখ। স্ফীত নাসারন্ধ্র। একটি বছরের সবগুলো স্মৃতি ঘুরপাক খাচ্ছে ওর মাথার ভেতর। আজ যেন তার মনে হচ্ছে কোনো কাজ নেই। চেয়ারে বসে থেকেই ঘড়ির কাঁটা ছুঁই ছুঁই করছে বেলা দু'টোর ঘরে। জামান সাহেব ঝোলানো ব্যাগটা কাঁধে চেপে সিঁড়ি ভেঙে নেমে আসে নিচে। কম্পিত নেতিয়ে পড়া চোখ। অস্থিরতার ভেতর কেটে যাচ্ছে, কিছু সেকেণ্ড, কিছু মিনিট, আবার ঘন্টাও। মিতার অবাধ্যতা-রতনের চাকুরী-দোলনার ছল্‌ছল চোখ সবকিছু ধোঁয়ার কুণ্ডলির মত জটলা করছে ওর নীরব মস্তিষ্কে।

সামনে বিশাল অবারিত আকাশ। মুখ ও কপাল বেয়ে সরে যাচ্ছে লু হাওয়া। এক গাদা প্রশ্ন দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে চিন্তার ভেতর ছুটোছুটি করছে ফুটবলের মতো। রাস্তায় মানে প্রশাসনিক ভবনের পাশে এসে জোরে জোরে ক'বার শ্বাস নিলেন। ভাঙা বুক নিংড়ে বেরিয়ে আসে গাঢ় নিশ্বাস! চেহারায় ফুটে ওঠে বিষাক্ত নীল এলামেলো ছায়া। সহসা মাথাটা ঝিমঝিম করে! পা টেনে টেনে সামনের দিকে এগোচ্ছে। বলা চলে ধীর গতিতে। ঠিক যেন এক ঝাঁক ভিমরুল, এক্ষুণি সিঁড়ি ভেঙে নামাবার সময় ওর সমস্ত শরীরে, একটা একটা করে হুল বসিয়ে আরক্ত নীল চেহারা ধারণ করেছে। বিষাক্ত যাতনায় শরীর আর যেন সামনের দিকে এগোতে চাচ্ছে না। টালমাটাল বিশৃঙ্খল দেহটার তবু সামনে এগোবোর চেষ্টা। ঠিক তক্ষুণি বাসটি পেছন থেকে ধাক্কা মারে সজোরে। ছিটকে পড়ে জামান সাহেবের দেহটা পিচঢালা রাস্তার মেঝেয়। একবার শুধু চোখের কর্ণিয়ায় ভেসে ওঠে রতন-মিতা-দোলনার নিরাসক্ত চেহারার অবকাঠামো।

www.pathagar.com

সে আমাকে কয়েকটি রাত উপহার দিয়েছিল

আবু নোমান একটি বেসরকারি ব্যাংকের সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত তরুণ অফিসার। পুকুরের মাছ ডাঙায় উঠলে যেমনটি হয়, নোমানের অবস্থা ঠিক তেমনি। তাই ব্যাংকের রসকষহীন কাজের মধ্যে সাপ্তাহিক ছুটির দুটো দিন বাসায় গেলে ইন্টারনেট হয়ে উঠে ওর নিত্যসঙ্গী। ইন্টারনেটের অনেক কিছুই তার কাছে ভালো লাগে। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভালোলাগে ফেসবুক।

একদিন পৌষের আলোকিত ঝলমলে জ্যোৎস্নার রাত। চারদিক নিঝুম-নিঃস্তব্ধ। জ্যোৎস্নার আলো গায়ে মেখে ছাদ থেকে ঘরে ফেরে আবু নোমান। কম্পিউটারে বসে ফেসবুকে ঢুকতেই একটি নাম তার দারুণভাবে নজর কাড়ে—রওনক। নোমান জানতে পারে একটি পাকিস্তানী মেয়ে, বয়স তার চেয়ে দু'বছর কম। মেয়েটি কথায় যেমন চটপটে, তেমনি বুদ্ধিতেও বেশ পারঙ্গম। একটি বিদেশী মেয়ের সাথে বাকযুদ্ধে পেরে ওঠার ক্লান্তি দূর করতে সচেতন হয় নোমান। এর পরেই ঘটে গেল সম্পূর্ণ এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা। সুলতানা রাজিয়া রওনক নামের পাকিস্তানি মেয়েটি চ্যাটিং-এর সময় নোমানকে এক অদ্ভুত প্রশ্ন করে, তুমি কি আমাকে বিয়ে করতে চাও?

সহসা চমকে উঠে নোমান। গাছ থেকে পিছলে পড়া মানুষের মতো মুহূর্তে আঁতকে উঠে। থমকে যায় চলন্ত হাত। ও প্রথমে যতটুকু স্মার্ট ভেবে ছিল নিজেকে, এখন ততগুণ বোকা ভাবা শুরু করেছে। আবার অপর প্রান্ত থেকে প্রশ্ন এলো, কি ব্যাপার কিছু বলছো না যে? বিদেশী একটা মেয়ের কথায় ঘাবড়ে গেলে নাকি। তখনও নোমান নিজেকে ঠাওরাতে পারছে না। মনে মনে ভাবলো, সামনা-সামনি পেলে মেয়ে তোমাকে

www.pathagar.com

বুঝিয়ে দিতাম বিয়ের কেমন সাধ! কয়েক মুহূর্ত চুপ থাকার পর নিজেকে শক্ত করে নোমান এবার সিদ্ধান্তে আসে, মেয়েটি আসলে রসিক, দেখা যাক জমবে ভালো। তাৎক্ষণিক বলে ফেলে, হ্যাঁ করতে চাই।

তাহলে করো।

এই কবুল বলছি, এবার কিন্তু তোমার পালা।

– না, এভাবে নয়। বলো, এই ফেসবুককে এবং নিঝুম রাতকে সাক্ষী রেখে আমাকে বধূ হিসেবে গ্রহণ করছো।

হ্যাঁ করছি।

আমিও তোমাকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করলাম।

এবার নোমান একই সঙ্গে যেমন উৎফুল্ল তেমনি হতবাকও হলো। নিজের অজান্তে বলে ফেলে, তাহলে আমাদের বিয়ে হয়েই গেল?

অপর প্রান্ত থেকে জবাব এলো, হ্যাঁ, এখন কী করতে চাও।

এবার নোমানের মাথায় কিছুটা দুষ্টুমি নড়েচড়ে উঠে। চলো বাসর রাত উদ্‌যাপন করি।

না, না। বাসর কি বিয়ের পাঁচ মিনিট পরেই হয়। কন্যা বিদায়, আরও অনেক পর্ব, তারপর কোনো এক নিস্তব্ধ প্রহরে। তার চেয়ে তোমার রোমান্টিক মনটার সঙ্গে আমি এখন গল্প করতেই পছন্দ করবো। তুমি কি বলো?

নোমান মনে মনে ভাবলো, সদ্য বিয়েকরা বউ-এর মনতো অবশ্যই রক্ষা করতে হয়। বললো, ঠিক আছে তোমার যা ইচ্ছে।

আচ্ছা, আমাকে বিয়েতে কোন উপহার দেবে না?

এবার নোমানের কল্পনার ঘোড়া দ্রুত ছুটতে লাগলো। বলতে থাকে, তোমাকে আমি একটি সুন্দর সেন্টমার্টিন দ্বীপে ছোট্ট কাঠের দোতলা বাড়ি উপহার দিলাম। যার সৈকতটা থাকবে সম্পূর্ণ নির্জন। আমাদের বাড়িটার সামনে থাকবে কয়েকটা বাঁকানো নারকেল গাছ। পড়ন্ত বিকেলে আমরা দু'জন সেই বাঁকানো নারকেল গাছের উপর দিয়ে সূর্য ডোবার দৃশ্য দেখতে থাকবো—কেমন?

রওনক এবার চরম উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠলো। নোমান ভাবলো, পাকিস্তানি ছেলেরা মনে হয় এতোটা রোমান্টিক নয়। অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এলো, তোমার উপহার তো খুবই ভালো লাগলো, এবার কি করতে চাও বলো?

তোমার যা ইচ্ছে।

এবার তাহলে আমাকে হানিমুনে নিয়ে চলো।

তা কোথায় যেতে চাও?

যেখানে নিয়ে যাবে।

এই 'যেখানে নিয়ে যাবে' কথাটি নোমানের কাছে একই সঙ্গে রোমান্টিক এবং আস্থাশীল মনে হলো। এই কথাটি কারো প্রতি অগাধ বিশ্বাস, আনুগত্য, হৃদয়ের ফ্রেমে

www.pathagar.com

বুনোনের গভীরতা ছাড়া বলা সম্ভব নয়। নোমান এবার আবেগে উচ্ছ্বাসিত হয়ে বলতে লাগলো, তোমাকে নিয়ে আমি হানিমুনে প্রথমেই যাবো সম্রাট শাহজাহানের আগ্রার তাজমহল। যেখানে ঘুমিয়ে আছে পৃথিবীর এক অনন্য গুণবতী, নারী-সৌন্দর্যের রাণী—মমতাজ। সম্রাট শুধু তার রূপেই নয়; যার রূপ-গুণ, বুদ্ধিমত্তা ও প্রেমে এতোই মুগ্ধ ছিলেন যে, প্রিয়তমার মৃত্যুর পর জীবনকে স্বাভাবিক ভাবে মেনে নিতে পারছিলেন না। ঠিক তখনি সম্রাটের মাথায় এলো তাজমহল তৈরীর ভাবনা। এই প্রেমের সমাধিতে অ-নে-কক্ষণ কাটানোর পর তোমাকে নিয়ে যাবে ভেনিসে। সেখানে গেলে তো আমার মনে হয় তুমি পাগল হয়ে যাবে। ভেনিসে প্রমোদতরীতে তোমাকে নিয়ে দিনের পর দিন কাটিয়ে দেব। আকাশরঙের পোশাক থাকবে আমাদের দুজনের শরীরে। দুজন দুজনকে পানি ছিটাতে ছিটাতে এক সময় একে অপরকে জড়িয়ে ধরে কাহিল হয়ে পড়বো। কেউ দেখে ফেলার আগেই আমরা সেখান থেকে তারুণ্যের উচ্ছ্বাসে ভর করে লোকচক্ষুর অগচরে নীল সীমানায় হারিয়ে যাবো। তারপর সেখান থেকে চলে যাবো হাজারো যুবক-যুবতীর স্বপ্নের দেশ সুইজারল্যান্ড। এরপর চলে আসবো তোমাদের দেশের সিন্ধু প্রদেশে। যেখানে শুধু চোখ মেলে দেখবো, বালির ঢেউ আর উটের সারি। এরপর তোমাকে নিয়ে সোজা চলে আসবো দীর্ঘ স্মৃতি বিজড়িত দোয়েল-কোয়েল- এর কণ্ঠ বিজড়িত আমাদের ক্যাম্পাস...

নোমানের কথা শেষ না হতেই অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এলো, হয়েছে, কল্পনার ফানুস ওড়াতে পাকিস্তানি ছেলেদের চেয়ে তুমি ভীষণ পারদর্শী।

নোমান বলে, শুধু হানিমুন করবে, কিছু খাবে না?

খাবো আর কী? হানিমুনেই তো পেট ভরে গেছে।

তারপরও তো কিছু খাবার তোমার জন্য সাজিয়ে রেখেছি।

ঝাল না মিষ্টি?

মেয়েরা তো বেশী ঝাল পছন্দ করে, তাই ঝাল-ই রেখেছি।

তাহলে তো দারুণ মজা, নাম বলো দেখি।

এই ধরো, ইলিশের ঝোল, টাকি মাছের ভর্তা, চিংড়ি মাছের দোপেঁয়াজো, কদবেলের চাটনি....

হয়েছে হয়েছে আর বলো না, এতো খেয়ে তো আর নড়তে পারবো না। ঘুমাবো কিভাবে?

আজকের রাতটা নাই বা ঘুমালে।

তুমি জানো কি, সকালে আমার অনেক কাজ। না ঘুমালে চলবে?

কি এমন কাজ বলা যায়?

আমার কাজের ফিরিস্তি শুনবে?

www.pathagar.com

বলো।
আমি লাহোর ইউনিভার্সিটির জার্নালিজমের ছাত্রী, কম্পিউটারের উচ্চতর কোর্স করছি। এছাড়াও একটি বিউটি পার্লারে কাজ করি।
বউ যখন এতো ব্যস্ত তখন তো ঘুমোতে দিতেই হয়। কিন্তু তোমাকে ছাড়া যে আমার ঘুম আসছে না।
আজকের মতো ঘুমাও কেমন, আগামীকাল আবার কথা হবে।
তাহলে কিছু একটা দাও।
কি চাও?
ছোট্ট একটা...
ঠিক আছে দিলাম।
ঘড়ির কাঁটায় রাত চারটা বাজে।

এবার ফেসবুক থেকে বেরিয়ে দুজনে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘটনার দুদিন পরে ফেসবুকে রওনকের সঙ্গে নোমানের আবার যোগাযোগ হয়। রওনক তার ভবিষ্যত জীবনের নানা পরিকল্পনা, ক্যারিয়ার গঠনের অবকাঠামো সবকিছুই খোলামেলা বাংলাদেশী যুবক নোমানকে জানালো। নোমান তো ভেবেই পাচ্ছে না এই মেয়ের জীবনবোধ, ক্যারিয়ার গঠনসহ সবকিছুতেই এতো সচেতন! অথচ সে পুরুষ হয়েও একটি মাত্র চাকরি নিয়েই সন্তুষ্ট। আর আমাদের দেশের অধিকাংশ মেয়েই বিয়ের সার্টিফিকেট পেলেই নিশ্চিন্তে জীবনকে কাটিয়ে দেয়। কখনও ভেবে দেখে না, পৃথিবী-সমাজ-জাতি ও নিজ বংশধরের প্রতি আমারও কিছু কর্তব্য আছে।

পরের দিন আবার ফেসবুকে যোগাযোগ হয়। নোমানকে রওনক জানায়, তোমার আরো কিছু নতুন ছবি পাঠাও। নোমান কৌশলে এড়িয়ে গিয়ে বললো, তোমার কিছু নিউ স্টাইলের ছবি পাঠাও, তারপর আমি সুযোগ বুঝে পাঠাবো। অথচ নোমান মনে মনে ভাবলো, দুদিন পর এই মেয়ে ঠিক-ই সব ভুলে বসবে।

কয়েকদিন পরের ঘটনা।

ফেসবুকে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে নোমানকে ধরলো রওনক।

আমার ছবি গুলো পেয়েছো?

কই না তো!

তোমার মেইল চেক করো ভালো করে, তাহলেই পাবে।

নোমান তো কথা শুনে রীতিমতো অবাক! কিন্তু এর চাইতেও আরও চমক অপেক্ষা করছিল নোমানের জন্যে। মেইল চেক করে দেখে সত্যিই তো মেয়েটি অনেক গুলো ছবি পাঠিয়েছে। নোমান কল্পনাও করতে পারেনি যে, বৈচিত্রময় ভঙ্গির এতোগুলো ছবি

www.pathagar.com

সে একসঙ্গে দেখতে পাবে! এক পাশ থেকে তোলা একটি ছবির মায়াবী চোখ আর উন্নত চিবুক ওকে ভীষণ ভাবে ভাবিয়ে তোলে—মেয়ে মানুষ সুন্দর হয়, তাই বলে এতো সুন্দর!

নোমান ফেসবুকে ফিরে এলো কিছুটা অস্বস্থি নিয়ে। মনে মনে ভাবে, মেয়েটা কী সত্যি সত্যিই সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছে? এবার হাসি মুখে বলে, তুমি তো দারুণ সুন্দরী!

তোমার পছন্দ হয়েছে?

হ্যাঁ ভীষণ, ভীষণ পছন্দ হয়েছে!

শোন, তুমি পাকিস্তান আসছো কবে?

নোমান তো অবাক! এতো সুন্দর মেয়ে, কিন্তু থেকে থেকে কেমন যেন খাপছাড়া কথা বলে। আবার ভাবে, উড়ন্ত যৌবনের মেয়েরা বুঝি এমন-ই হয়। আবার ভাবে, পাকিস্তানি মেয়েটি সত্যিই বুঝি পাগল।

এবার রওনক বলে, কি হলো, কিছু বলছো না যে?

নোমান মনে মনে ভাবলো, ভনিতা ছেড়ে সত্য কথাটাই বলা ভালো।

সত্যি কথা কি জানো, আমার আসলে পাকিস্তানে যাবার মতো সামর্থ নেই।

তাহলে তোমার ঠিকানা দাও, আমিই বাংলাদেশে চলে আসছি। তোমাকে আমার দেখতে দারুণ ইচ্ছে করছে।

নোমান এবার প্রকৃতই ভড়কে যায়। মজা করতে গিয়ে শেষে আটকে গেল নাকি। অনেক ভেবে চিন্তে জিজ্ঞেস করে, তুমি কি সিরিয়াসলি বলছো?

অবশ্যই।

আমার মনে হয় তুমি ভুল করছো।

ভুল নয় নোমান, আমি ঠিকই বলছি। আমাকে যদি তোমার ভালো না লেগে থাকে, তবে শুধু শুধু আমার মূল্যবান সময়গুলো নষ্ট করলে কেন?

আমার কথা শোনো, সেন্টিমেন্টাল হলে কি জীবন চলবে? তা ছাড়া আমাদের সমাজ-সংস্কৃতি-দেশ সব কিছুই আলাদা। তোমার মতো একটা নিরহংকার মেয়ে আমাদের সমাজে পরিবেশে খাপ খেয়ে চলতে পারবে না। তুমি অনেক কষ্ট পাবে, আঘাত পাবে, যা তোমার নিষ্কলুষ কোমল মন সহ্য করতে পারবে না। বেশ কিছুক্ষণ গুম মেরে বসে থাকার পর রওনক দুম করে বলে বসে, আমি তোমার কোনো কথা শুনতে চাই না। তুমি ঠিকানা দেবে কি-না বলো?

নোমান ততক্ষণে বুঝে ফেলেছে, ওর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার অবস্থা! অনেকক্ষণ পর ধীরে ধীরে জানায়, তুমি কি আমার মঙ্গল চাও?

www.pathagar.com

অবশ্যই চাই।

তাহলে তুমি বাংলাদেশে এসো না।

রওনক উত্তেজিত হয়ে বলে, এতোদিন পর তুমি আমাকে কি শুনালে নোমান! আমার জন্য তোমার অমঙ্গল হবে।

তোমার জন্য নয়, তুমি এলে সমস্যা হতে পারে।

তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, তুমি আমাকে খুলে বলো।

সবকিছু জানতে চাইলে তোমাকে আরও এক ঘন্টা বসে থাকতে হবে। রাজি?

আমি রাজি নোমান, তবু তুমি বলো।

শোন, আমার বাবা একজন কট্টরপন্থী মানুষ। তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা। পুরোনো ঐতিহ্যকে নিয়ে আজীবন বেঁচে আছেন। মুক্তিযুদ্ধে আমার দাদা-চাচা শহীদ হয়েছেন। আমার বাবা একটি পা হারিয়ে আজও ক্র্যাচে ভর করে বন্দিত্ব জীবনযাপন করছেন। ভীষণ একরোখা মানুষ। পাকিস্তানের মানুষ দূরে থাকুক পাকিস্তানের কথাই তিনি সহ্য করতে পারেন না। বিশ্বকাপ ক্রীকেটে একবার আমরা পাকিস্তানের সমর্থক ছিলাম। বাবা আমাদের উপর চরম ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। তার মতে, পাকিস্তান হচ্ছে বাংলাদেশের বিশ্বাসঘাতক সহদর। বৃটিশের কাছে স্বাধীন হয়ে দুটি দেশ হয়েছিল ভারত ও পাকিস্তান। ভারত একটি বড় উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে মাথা উঁচু করে আজও টিকে আছে, অথচ অনেক জাতির সংমিশ্রণ। কিন্তু পাকিস্তান তার সহদর ভাইকে আগলে রাখতে পারলো না। শুরু হলো যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা। আর যুদ্ধ করেই এদেশকে স্বাধীন করতে হলো অনেক রক্তের বিনিময়ে।

এবার নিশ্চয়ই বুঝেছো আমার বাবা কখনও তোমাকে মন থেকে মেনে নেবেন না।

রওনক সম্ভবত একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ধীরে ধীরে বলে, চল্লিশ বছর আগের একটি আনাকাঙ্খিত যুদ্ধের কথা তোমার পিতার মতো মানুষেরা আজও মনে রেখেছেন? আর তখনকার মানুষগুলোর জন্য কী আমরা দায়ী? আমাদের কী অপরাধ? আমরা তো তখন পৃথিবীতেই আসিনি।

বললাম তো, আমার বাবা কট্টর মানুষ। পাকিস্তান কথাটিই তার সামনে উচ্চারণ করা যায় না। এ জন্যে বলছিলাম, তুমি ভুল করছো।

দ্যাখো নোমান, তুমি আর যাই-ই বলো অন্তত আমাকে—'না' বলো না। আমি তো তোমাকে কোনো কিছু দিয়ে আটাকে রাখিনি। আমি তোমাকে শর্তহীন ভাবে ভালোবেসেছি। আমাদের দেশে কি বন্ধুর অভাব? না। তবে তোমার সঙ্গে কিভাবে জড়ালাম আমি নিজেই জানিনা। আবার এটাও হতে পারে প্রযুক্তির সফল ব্যবহার-ই তোমাকে আমার এতো কাছে নিয়ে এসেছে।

www.pathagar.com

কিছুক্ষণ থেমে থেকে রওনক আবার বলে, তুমি কী জানো, গত আটচল্লিশ ঘন্টা এই মেয়েটি তোমার কথা ছাড়া আর কিছুই চিন্তা করেনি। অপেক্ষায় থেকেছে কখন রাত ১১ টা বাজবে আর তার সঙ্গে চ্যাটিং করবো। আমার অনুরোধ, তুমি আমাকে বাংলাদেশ আসতে 'না' বলো না।

নোমান বললো, তুমি ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো। এখানে এলে অনেক ঝামেলায় পড়বে। আর যায়-ই হোক তুমি এ পাগলামিটা করো না।

কী! তোমার কছে আসাটাকে তুমি পাগলামি বলছো? তোমার সঙ্গে আর কখনও কোনো অবস্থাতে যোগাযোগ করবো না। সেই সাথে আর কখনও কারো সঙ্গে ফেসবুকে যোগাযোগও রাখবো না। তোমার মতো একজন সাহসহীন পুরুষের পর, দ্বিতীয় কোনে ব্যক্তি আমার জীবনে কখনও আসবে না। কিন্তু তোমাকে আমি সব সময় মনে রাখবো, ভালোবাসবো। জীবনে এই প্রথম আজ কেউ আমাকে খুব কাঁদালো। তারপরও তোমাকে মনে রাখবো। কেন জানো? একমাত্র তুমি-ই আমাকে কয়েকটি সুন্দর প্রশান্তিময় রাত উপহার দিয়েছো...

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সে আমাকে কয়েকটি রাত উপহার দিয়েছিল
মাতিউর রাহমান

প্রচ্ছদ : কামরুল হাসান মিলন

পরিলেখ

একটি পরিলেখ প্রকাশনা

978-984-8867-41-3